41044

cat

মাহবুব-উল আলম

মাহবুব-উল আলম স্মৃতি-সভা ও
স্বর্ণ পদক প্রদান অনুষ্ঠান, ১৯৮৪
উপলক্ষে প্রকাশিত স্যুভেনীর

928.9144
SAM

"ডক্টর নই, প্রফেসর নই,
আমি সাহিত্যের দিনমজুর"

Scanned with CamScanner

সম্পাদনায়ঃ সবিহ উল আলম

সম্পাদনা উপদেশনায়ঃ সায়ফুল আলম

সহযোগী সম্পাদনায়ঃ মোহিতুল আলম

সম্পাদনা সহকারীঃ সৈয়দ আলম জাহিদ

মাহবুব-উল আলম স্মৃতি সংসদের পক্ষে মঈনুল আলম কর্তৃক ইয়াসমীন প্যালেস, জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত ও বিল্লাহ প্রিন্টার্স, ৯৪, সিরাজুদ্দৌল্লা রোড, চট্টগ্রাম হইতে মুদ্রিত।

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিজীবির মুখে ছাই ৭
সংকটের চেহারা ২৩
নল থাকবে আকাশ মুখী ৩০
প্রধান অতিথি ৩৪
যেন : তেন ৩৯
সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম
—সৈয়দ আলী আহসান ৪৭
মাহবুব-উল আলম স্মরণে
—অধ্যাপক আসহাবউদ্দীন আহমদ ৫৩
পয়লা মে থেকে বাইশে শ্রাবণ
—আবুল মোমেন ৬০

গত ২৪শে এপ্রিল ১৯৮৪ ইং চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানের সম্মেলন কক্ষে দৈনিক আজাদী সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ খালেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নাগরিকদের এক সভায় জাতির বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিক ও সাংবাদিক চট্টল গৌরব মরহুম মাহবুব-উল আলমের স্মৃতিতে প্রতি বছর উৎকৃষ্টতম সাংবাদিকতা ও সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য মাহবুব-উল আলম স্বর্ণ পদক ও নগদ ২৫০০ টাকা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। লোক-সংস্কৃতি গবেষণার জন্যও দ্বি-বার্ষিক ভিত্তিতে স্বর্ণ পদক ও অর্থ প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

মরহুম মাহবুব-উল আলম (মৃত্যু ৭ই আগষ্ট ১৯৮১) তাঁর সাহিত্য কর্মের জন্য তদকালীন পাকিস্তানে সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার প্রেসিডেন্ট পদক পাইয়াছিলেন। বাংলাদেশেও তিনি সর্বোচ্চ জাতীয় পুরস্কার একুশের পদক লাভ করেন। "বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস" বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং নবীন জাতির প্রতি মরহুম মাহবুব-উল আলমের মহত্তম অবদান।

Scanned with CamScanner

মাহবুব-উল আলম স্মৃতি সংসদ

উপদেষ্টাগণ ঃ

জনাব আব্দুল হক ফরিদী

সৈয়দ আলী আহসান

শ্রী অন্নদা শংকর রায়

ডঃ এ, টি, এম, আনিসুজ্জমান

কাজী আবুল কাসেম

জনাব আলাউদ্দিন আল আজাদ

নির্বাহী কমিটি ঃ

সভাপতি ঃ জনাব মাহমুদুল ইসলাম

সদস্য ঃ জনাব জাহিদ হোসেন

অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ

জনাব জহিরুদ্দিন খান

জনাব মীর্জা আবু মনসুর

জনাব এম, এ, হাশেম

জনাব সিরাজুদ্দিন আহমদ

জনাব মনিরুজ্জমান

জনাব সবিহ্উল আলম

জনাব জিয়া হোসেন

জনাব মঈনুল আলম

(সদস্য-সচিব)

Scanned with CamScanner

আবুল ফজল, হাবিবুল্লাহ বাহার ও মাহবুব-উল আলম

(বাংলা ১৩৩৭ সালে মাহবুব-উল আলমের উদ্যোগ হাতে লেখা 'আলম পরিবার পত্রিকা' নিয়মিত বের হতে থাকে। তিনিই ছিলেন একাধারে পত্রিকার সম্পাদক ও লিপিকার। ৭″×৯″ সাইজের এক্সারসাইজ খাতায় বাংলা ৮ পয়েন্ট টাইপের চাইতেও ছোট হরফে তিনি এ পত্রিকা লিখেছেন। বৈশাখ ১৩৩৭ থেকে আশ্বিন ১৩৩৭ মোট ছয়টি সংখ্যার খোঁজ পাওয়া যায়। পারিবারিক সদস্যরাই মূলতঃ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এ পত্রিকায় লিখতেন। বিচিত্র বিষয়ের মাঝে একটি ছিল অভিনব—তা' হলো বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে মাহবুব-উল আলমের মতামত ও টিপ্পনি এবং এ পর্যায়ে তিনি নিজেকেও মতামত ও টিপ্পনি থেকে রেহাই দেননি।)

আবুল ফজল ও মুহম্মদ হাবিবুল্লাহ বাহার—এই দুই বন্ধু কল্য আসিয়া অদ্য (৩০শে বৈশাখ) চলিয়া গেলেন।

আবুল ফজল—একটু cool; আত্ম-প্রত্যয়ী; এখনও অভাব আছে—সেটা tragic experience of a fall এর; মনটা কিছু ethical; দায়ীত্ব-জ্ঞান আছে; এই চরিত্র সম্মান পায়,—ভালবাসা পরের কথা।

Refuses to be led by emotions. এইখানেই তাহার সহিত আমার তফাৎ। এ দার্শনিক বনিতে পারে,—কিন্তু কবি কখনই নহে।

Scanned with CamScanner

বাহার শিশুর সহিত কি একটা সাদৃশ্য আছে। Sportsman কিনা, মনটা একদন্ডও স্থির নাই। বরাবর উঁকি মারিয়াই চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণও চলিতেছে বেপরোয়া—দায়ীত্বের খাতির না রেখে বড় কৌতুহলী।

একে ভাল লাগে—সম্মানের প্রশ্ন ওঠেই না। ভালবাসতে ভয় হয়—কারণ, বড় active.

Passivism এ আমি ও আবুল ফজল এক plane এ; এর হইতেছে activism. ভিতরে depth কতখানি তাহা উপর হইতে বোঝার জো নাই

কোন limitations মান্‌তে রাজী নয়। যদি কখনও emotion এর দ্বারা পরিচালিত হয় এর দ্বারা অনেক অসম্ভবও হইতে পারে। প্রশ্ন হইতেছে—determination কতখানি ?

... ...

দুজনকেই মনে রাখিলাম।

(বিঃদ্রঃ—এই দুই ব্যক্তির সম্পর্কে মতামত ও টিপ্পনি তাঁদের গোচরে ছিল, কেননা লেখার উপরিভাগে ১/৫/৩০ (ইংরেজী) তারিখ সম্বলিত তাঁদের স্ব স্ব সাক্ষর পাওয়া যায়।)

শম্‌সু—প্রিয় ! খেয়ার অপর পার যে দেখা যায় ! হিসাব ঠিক আছে কি?

[আলম পরিবারের দিশারী শম্‌সুল আলমই সংক্ষেপে শম্‌সু। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত হয়ে আলম পরিবার শিল্পের বিভিন্ন অঙ্গনে ছড়িয়ে পড়ে।)

মাহ্‌বুব—একটা জানোয়ার—good in its own way. Instinct এ চলে। কিন্তু, বড় অসহায়। প্রতি পদক্ষেপেই যুদ্ধ এত প্রখর যে, compromise ই তাহাকে করিতে হইতেছে, যদিও জয় ছাড়া তাহার আনন্দ নাই—compromise তাকে পীড়া দেয়। সুতরাং সব সময়ে নিজেকে মনে হয় incarcerated. কাজেই পতনকে ভয়ের আমার সমস্যা নয়। আমার সমস্যা হইতেছে পতনেও—to remain good in my own way.

৩৩ তম অঙ্কের যবনিকা উঠিয়াছে। ওগো জীবন-স্বামি ! অভিনয় যাহাই হউক, আমায় ক্ষমতা দিও—to remain good in my own way.

Scanned with CamScanner

মাহবুব-উল আলমের গ্রন্থপঞ্জী

১।	তাজিয়া গল্প	১ম মুদ্রণ	১৯৪৬ সাল
		২য় ,,	১৯৪৯ ,,
		৩য় ,,	১৯৬৬ ,,
২।	মফিজন (বড় গল্প)	১ম মুদ্রণ	১৯৪৬ সাল
		২য় ,,	১৯৪৮ ,,
		৩য় ,,	১৯৬৪ ,,
৩।	বর্মার হাঙ্গামা		
৪।	চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল)	১ম মুদ্রণ	
		২য় ,,	১৯৫০ ,,
		৩য় ,,	১৯ ৫ ,,
		৪র্থ ,,	১৯৬৫ ,,
৫।	চট্টগ্রামের ইতিহাস (কোম্পানী আমল)	১ম মুদ্রণ	১৯৪৭ সাল
		২য় ,,	১৯৬৬ ,,
৬।	চট্টগ্রামের ইতিহাস (নবাবী আমল)	১ম মুদ্রণ	
		২য় ,,	১৯৪৭ ,,
		৩য় ,,	১৯৫৫ ,,
		৪র্থ ,,	১৯৬৫ ,,
৭।	গাঁয়ের মায়া (গল্প)	১ম মুদ্রণ	১৯৪০ সাল
		২য় ,,	১৯৫৫ ,,
৮।	পঞ্চ অন্ন (গল্প)	১ম মুদ্রণ	১৯৫৬ সাল
		(লেখকের ৫৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে)	
৯।	সংকট কেটে যাচ্ছে (সাহিত্য)	১ম মুদ্রণ	১৯৫৪ সাল
১০।	কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার (১ম খন্ড)	১ম মুদ্রণ	১৯৬৬ সাল
১১।	কতিপয় বিশিষ্ট পরিবার (২য় খন্ড)		১৯৬৬ সাল
১২।	ফতেয়াবাদ রাজ্য	১ম মুদ্রণ	১৯৬৭ সাল
১৩।	অলিদরবেশ	১ম মুদ্রণ	১৯৬৮ সাল
১৪।	চট্টগ্রাম রোশাঙ্গ	১ম মুদ্রণ	১৯৬৯ সাল
১৫।	জোরারগঞ্জ হাইস্কুল	১ম মুদ্রণ	১৯৬৯ সাল
১৬।	শাহ বাকের পরিবার	১ম মুদ্রণ	

১৭। আলাপ (সাহিত্য) ১৮। মোমেনের জবানবন্দী ১৯। পল্টন জীবনের স্মৃতি ২০। গোঁফ সন্দেশ ২১। ইউনেস্কো কর্মসূচীতে লিখিত দেশ পরিচয় মূলক বই : বার্মা, সিলোন, ইন্দোনেশিয়া, তুর্কী, সৌদী আরব, পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষী, পূর্ব পাকিস্তানের বনক্ষেত্র, পূর্ব পাকিস্তানের মৎস্য সম্পদ ২২। দিদারুল আলম জীবন কথা ২৩। কৃতী জীবন।

Scanned with CamScanner

"বুদ্ধিজীবির মুখে ছাই" শীর্ষক প্রবন্ধটি মাহবুব-উল আলমের জীবনের শেষ লেখা। এই প্রবন্ধটি লিখা কালে মাহবুব-উল আলম পথচলার সময় পিছন হতে রিক্সার প্রচন্ড ধাক্কায় আঘাত পেয়ে রাস্তায় পড়ে যান বৌদ্ধ মন্দির সড়কে। তারপর তিনি যে বিছানা নিলেন সেই বিছানায় প্রায় ৬ মাস অসুস্থতায় ভুগে ইন্তেকাল করেন। ফলে "বুদ্ধিজীবির মুখে ছাই" লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

Scanned with CamScanner

বুদ্ধিজীবীর মুখে ছাই

—মাহবুব-উল আলম

বুদ্ধিজীবী কথাটা এ দেশেই খুব চোখা হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর আর কোন দেশেই এ কথাটার উপর এত বেশী জোর দেওয়া হয় না।

মানুষ মাত্রেই বুদ্ধিজীবী। বস্তুতঃ বুদ্ধি আছে বলেই সে মানুষ, প্রাণীজগতের শ্রেষ্ঠ। নতুবা, ইতর-প্রাণী বা জন্তু-জানোয়ারের সাথে তার কোন পার্থক্য থাকতো না।

কিন্তু, বঙ্গে তথা বাংলাদেশে 'বুদ্ধিজীবী' কথাটা এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার হয়ে আসছে। 'বুদ্ধিজীবী' সাধারণতঃ লেখা-পড়া জানা মানুষ।

এই লেখা-পড়াকে 'কোরাণ'-এ কোন স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি। দেখান হয়েছে যে বনি-ইস্রাইল যখন ঠিক পথে চল্‌ছিল তাদের পথ-ভ্রষ্ট করেছিলেন যিনি তিনি হচ্ছেন পণ্ডিত সামেরী— এক বুদ্ধিজীবী— লেখা-পড়া জানা।

মুসা বনি-ইস্রাইলকে রওয়ানা করিয়ে দিয়েছিলেন নিরাকার একেশ্বরের উপাসক রূপে। এখন পণ্ডিত সামেরী বল্লেনঃ চলো হে, আমরা একটা সোনার গো-বৎস বানাই এবং তাকে পূজা করি।

মুসা ছোট ভাই হারুণকে সঙ্গে দিয়েছিলেন বনি-ইস্রায়েলের রক্ষক ও পথি প্রদর্শক রূপে। হারুণ কাজে বেরিয়েছিলেন। ফিরে এসে দেখেনঃ বনি ইস্রায়েল একেশ্বরবাদ ছেড়ে প্রতিমা-পূজক হয়ে গেছে। বেপথু হয়ে গেছে।

পটিয়া রেল ষ্টেশনে একদিন ট্রেনের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিলুম। এক ব্যক্তি এসে সালাম কর্লেন। দেখিঃ আমার এক দূর সম্পর্কের ভাগ্নে। জিগ্যেস কর্লুমঃ বাবা, ভাল আছ? তোমার কয়টি ছেলে-মেয়ে?

Scanned with CamScanner

বল্লে ঃ একটি মাত্র মেয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই গভীর দীর্ঘ-শ্বাস ফেল্লে।

আমি প্রশ্ন কর্লুম ঃ বাবা, দীর্ঘশ্বাস ফেল্লে কেন? উত্তর কর্লে ঃ মেয়েটিকে বেশী লেখা পড়া করাতে পারি নি!

আমি বল্লুম ঃ ও, এ ব্যাপার! আচ্ছা, বলো দেখি, আমার গাঁয়ে গেলে যে দয়া-মায়া পাই—আমাদের মা-মাসীদের হাতে—যাঁরা সকলকে সুখী করার জন্যে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন—তাঁরা কি লেখা পড়া জানা লোক?

ভাগ্নে বল্লে ঃ না, তাঁরা লেখা পড়া জানা নন্।

আমি বল্লুম ঃ বাবা কলমের আগায় এর জিনিস ওকে দেয় মামলা মোকদ্দমা লাগিয়ে দিয়ে সমাজকে শোষণ করে, সত্যকে মিথ্যা করে মিথ্যাকে সত্য করে তারা কি রকম লোক তারা কি নিরক্ষর অশিক্ষিত?

ভাগ্নে উত্তর কর্লে ঃ তারা লেখা পড়া জানা লোক।

আমি ঃ বল্লুম তবে? তুমি কেন আফসোস্ কচ্ছ যে তোমার মেয়েকে বেশী লেখা পড়া করতেপার নি? আসল প্রশ্ন হলো লোকের ভাল হওয়া, লোকের লেখা পড়া জানা নয়। জান? 'কোরাণ'-এ কেউ যদি ভাল কাজ করে তার পুরস্কার বলা হয়েছে ঃ তাকে ভাল লোকদের বৈঠকে আসন দেওয়া হবে—যে বৈঠকে প্রধান আসন হচ্ছে রসুলে আকরমের—আর কে না জানে যে রসুলে আক্রম নিরক্ষর ছিলেন।

ইহার তাৎপর্য এইযে ইসলাম শরীয়ৎ (শাস্ত্র), মারেফৎ (অধ্যাত্ম), তরীকৎ (গুরু প্রদর্শিত পথ) ও হকীকৎ (সত্য স্বয়ং সমুদ্ভাসিত)—সাধনার এই চারি মার্গই স্বীকার করে। এর কোন মার্গের জন্যই লেখা-পড়া জানা অপরিহার্য নহে।

নিরক্ষর ব্যক্তিকে রসুলে আক্রম কবে আল্লাহ্ তা'লা যেন মানুষকে তাঁর 'মরজি' সম্বন্ধে ইশারা করেছেন। কিন্তু, বঙ্গে তথা বাংলাদেশে বুদ্ধি

Scanned with CamScanner

জীবীরা তাঁদের বুদ্ধিজীবিতাকে অর্থাৎ লেখা-পড়া জানা বিদ্যাকে এমন এক নির্লজ্জ আত্মশ্লাঘায় এবং ভয়াবহ মানব-পীড়নের নজিরে পরিণত করেন মানুষের ইতিহাসে সম্ভবতঃ যার কোন তুলনা নেই। তাঁরা 'লেখা-পড়া' করাকে তাঁদের একচেটিয়া অধিকার ঘোষণা করেন এবং সমাজের বৃহত্তর অংশকে অযোগ্য ঘোষণা করে তাদের 'লেখা-পড়া' থেকে বঞ্চিত রাখেন। আবার, ইহাও করেন 'ধর্ম'-র নামে—তাও আবার 'সনাতন ধর্ম'।

ইতিহাস পর্যালোচনা কর্লে দেখা যায় বঙ্গ তথা বাংলাদেশের বুদ্ধি-জীবীরা দেশের নানারূপ ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে এক ন্যক্কারজনক ভূমিকা পালন করে এসেছেন।

এঁদের চরিত্র ক্রমে এরূপ দাঁড়িয়ে যায় যে তাঁরা প্রত্যেকেই আত্ম-সর্বস্ব হয়ে উঠেন। দশের হিতে কোনরূপ ব্যক্তি-স্বার্থ ত্যাগ দূরের কথা, তাঁরা এর ধারণাই কর্তে অক্ষম হয়ে পড়েন।

জাতি গঠনে তাঁরাই প্রধান বাধা হয়ে পড়েন। কারণ, এই সংকীর্ণ শ্রেণী রাষ্ট্রের সব লেখা-পড়ার কাজ একচেটিয়া অধিকার করে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা 'ঘুষ' 'দস্তুরী' 'পাওন' প্রভৃতি বসিয়ে ন্যায্য কর্তব্যের বদলে অন্যায় ভাবে আয় বৃদ্ধির উপায় করে নেয়।

এক দিকে যখনই যে শক্তি এ দেশের উপর শাসন কায়েম করেছে তাদের হাত থেকেছে ওদের পদ সেবায়, ওদের সঙ্গে সহযোগিতায়। অন্য দিকে তাদের পা থেকেছে এ দেশের জনগণের কাঁধে। অ রব্য উপন্যা-সের দৈত্যের মত পা দিয়ে গলা টিপে ধরে তারা জনগণের উপর শ্বাস-রোধী জুলুম চালিয়েছে।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নূতন নূতন জুটি করে তারা এক দিকে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে, অন্য দিকে জনসাধারণে উপর তাদের শোষণকে ক্রমে আরো কঠোর এবং সার্বিক করে তুলেছে।

Scanned with CamScanner

ধর্মের নামে পন্ডিত সামেরীর ন্যায় তারা এমন এক বিধান প্রবর্তন করে যা ঐকান্তভাবে স্থানীয় এবং পৃথিবীর অন্য কোন অংশের মানুষের সাথে যা মিল খায়না এবং যার যুক্তি ঐতিহাসিকতা তাদেরই পরবর্তী মনসবীগণ অসবীকার করেছেন। কিন্তু, তাদের আত্মশ্লাঘা এবং আত্ম-সম্মোহণ এত বেশী যে তাদের এই অসবীকৃতি কার্যকরী হয় নি, কালের গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে।

শুধু তাহাই নহে। তারা নবাগতদেরও দীক্ষিত করেছে তাদের এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তিতেঃ নবাগতরা পরিণত হলো নূতন এক বুদ্ধিজীবী সমাজে। কিন্তু, তারা 'সনাতনী' নহে। সনাতনী প্রাচীন বুদ্ধিজীবী সমাজ ইতিমধ্যে বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে নিজেদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। এই ক্ষমতার ভিত্তি থেকে তারা রব তুললেঃ শাসন এবং শোষণে আমরাও ভাগ চাই। নূতন বুদ্ধিজীবী সমাজও তাদের অনুকরণে লেগে গেল। জন্ম হলো এদেশে আন্দোলন ধর্মী রাজনীতি।

একদিন বিদেশী শাসন বন্ধ হয়ে গেল। উভয় বুদ্ধিজীবী সমাজই যার যার এলেকায় শাসন ও শোষণের সম্পূর্ণ এখতিয়ার পেয়ে গেল।

কিন্তু, যেহেতু নূতন বুদ্ধিজীবী সমাজের কোন সনাতন ভিত্তি নেই, ধ্বনিই হলো তাদের আন্দোলনের সর্বস্ব। তারা কোন সেবার কাজ জানে নি, নিজেদের দল ছাড়া আর কিছুই গড়ে তোলেনি। শাসনের তালিম তারা পায়নি, সনাতন বুদ্ধিজীবীদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ শিক্ষা তারা এড়িয়ে গেছে। এখন তাদের আশ্চর্য হবার পালা। এক কালে ধ্বনি দিয়ে কাঁধের ভূত তাড়ান সম্ভব হয়েছে। এখন ধ্বনিতে আর কাজ হচ্ছে না।

এক গৃহীনী উনানে ডাল চড়িয়ে দিয়ে ঘাটে গিয়েছিলেন। সবামীকে বলে গিয়েছিলেন ডালের উপর চোখ রাখতে, ডাল উৎড়িয়ে উঠতে পারে।

ডাল সত্যই উৎরিয়ে উঠ্‌ল। সবামীটি ছিল আমাদের হালের বুদ্ধিজীবী সমাজের ন্যায় ধ্বনিসর্বস্ব। সে ডালকে লক্ষ্য করে ধ্বনি দিতে

Scanned with CamScanner

লাগল। কিন্তু, উৎরানো ডাল কি আর ধর্বনিতে বাগ মানে! নিরুপায় বুদ্ধিজীবী তখন একই ধর্বনিকে বিভিন্ন প্রকারে উচ্চারণ করে 'দোহাই' পাড়তে লাগল: আমাদের হালের বুদ্ধিজীবী সমাজের হয়েছে সেই অবস্থা।

তাদের এই তালিম হয় নি যে রাষ্ট্রের স্থিতি হলো জাতীয় ঐক্যের উপর। একে তো দেশের নিরক্ষর অংশকে তারা জাতির অংশ বলেই গ্রহণ করে নি, তদুপরি বিদেশী আধিপত্যের অবসান হওয়ার 'শাসন' ও 'শোষণ এই দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে (এটা এ দেশের বরাবরের ঐতিহ্য) এখন 'শোষণ'ই বড় হয়ে উঠেছে। সেই শোষণেরও আবার কোন ধর্ম নেই। ব্যক্তি-ভিত্তিক, দল-ভিত্তিক সব রকম শোষণই চল্‌ছে।

যে যাকে পাচ্ছে শোষণ কচ্ছে। কে কাকে শোষণ কচ্ছে ঠিক নেই। আর শোষনের নিত্য নূতন হেকমৎ বেরুচ্ছে।

মুরগী কিনতে গেলাম। কেউ বেচে সের মাপা। এদের পাল্লা ওজন ঠিক নেই। পাল্লা ওজন দেখে নিলাম। মুরগী ওজন হবে এমন সময় দালাল এসে উপস্থিত। ঠিক পাল্লা ওজন দিয়ে এরা এমন ভাবে মেপে দেবে আপনি কয়েক ছটাক তো ঠক্‌বেনই, কিন্তু হাতে নাতে কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পার্বেন না। অথচ, বাড়ি এনে ওজন করুন, ঠিক দু ছটাক ঠকে গিয়েছেন।

ক্রেতা ঠকে যায় বিক্রেতারা দালালকে ভয় করে। দালাল মাঝখান থেকে কয়েক ছটাকের দাম মেরে নেয়।

কেউ বেচে ঠিকা। এরা করে কি, প্রায় একই রকমের মুরগী তিনটা তিনটা করে হালি বাঁধে। আসলে হালিগুলি থাকে সরস, মাঝারি, নীরস এ রকম বিভিন্ন ওজনের। আপনি একটা হালি দর কল্লেন, বিক্রেতা বল্ল: হবে না। আপনি মুরগী রেখে দিয়ে চলে আসলেন কিছু দূর সে ডেকে বল্লে: আচ্ছা নিয়ে যান। কিন্তু, এর মধ্যে সে হালি বদ্‌লে ফেলেছে।

Scanned with CamScanner

ঘরে এনে হিসাব করে ঃ প্রায় এক সেরের দাম সে মেরে নিয়েছে। এই দামটা দিয়ে আপনি ঠকামির একটা নূতন পদ্ধতি বুঝতে পার্লেন।

কিন্তু, কত আর বুঝবেন! আপনি একা চার ধারে শোষণের জগৎ গর্জন করে চলছে।

তবে সব শোষণই গিয়ে এক জায়গায় আঘাত করছে। সেটা জাতীয় ঐক্যের উপর। বুদ্ধিজীবীরা ভাবছে ঃ তাঁরা শোষণও চালাবেন আর দেশের চেহেরাও সঙ্গে সঙ্গে ভাল হয়ে উঠ্‌বে শুধু ধ্বনির জোরে, ধ্বনির নূতন নূতন হের-ফেরে। বুদ্ধিজীবীদের যাঁরা পাণ্ডা তাঁরা নিত্য-নূতন এই হের-ফের বের কচ্ছেন যেন বিজ্ঞানের কোন মহামূল্য আবিষ্কার তাঁরা করে ফেলেছেন দুখে ও স্বরে এমন একটা গাম্ভীর্য নিয়ে।

কিন্তু, গৃহ-বধূর ডালের ন্যায় উৎরাণের অশান্তি আর কিছুতেই কমছে না। স্বামীর ন্যায় তাঁরাও ভাব্‌ছেন কি আশ্চর্য!

অর্থনৈতিক এত ছিন্ন-ভিন্ন অবস্থা এ দেশে কখনই দেখা যায় নি। এই ছিন্ন-ভিন্নতা সমাজের সব স্তরেই ঢুকেছে। এক দিকে বহু লোক পরিস্থিতিকে মুকাবিলা কর্তে না পেরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে অন্যদিকে বহু লোক যেকোন মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করার ক্ষমতা অর্জন করে পুঁজির পাহাড় গড়ে তুলছে। এরূপ নির্লজ্জ শোষণ এ দেশে কখনই দেখা যায় নি। আইনের, নীতির, ধর্মের কোন বালাই নেই। শুধু সুযোগ সন্ধানেই সব তুরূপ হয়ে যাচ্ছে।

নূতন বুদ্ধিজীবীরা ভাবছেন ধ্বনি যখন দেশের সুস্থ চেহারা ফিরছেনা তখন কারণ বোধ হয় এই যে আমাদের হাতে আইনের যথেষ্ট ক্ষমতা নেই। সুতরাং, দিনকে দিন তাঁরা নিজেদের হাতে ক্ষমতার পর ক্ষমতা গ্রহণ করে চলেছেন। এখন চতুর্দ্দশ লুইর মত কেউ বলতে পারেন ঃ আমিই রাষ্ট্র।

কিন্তু, ডালের উৎরান তবুও বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ নেই।

Scanned with CamScanner

এই অবস্থা আরও বোঝাচ্ছে এই নূতন বুদ্ধিজীবীদের সত্যকার কোন দেশপ্রেম নেই। দেশ-প্রেম থাকলে তাঁরা জাতিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পার্তেন না।

জাতির কোন মর্যাদা বোধ নিয়েও তাঁদের কোন মাথা-ব্যথা নেই। যদি থাক্‌তো রাস্তা ঘাটে পড়ে এরূপ লোক মরে যাওয়ার দৃশ্যও আমাদিগকে দেখতে হতো না।

সাধারণ লোকেও বাংলা-দেশের নাম নিয়ে উপহাস কর্তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু, এতেও বুদ্ধিজীবীদের কোন টনক নড়ে মনে হয় না। শোষণের মুখ যেই তাঁরা পেয়েছেন জোঁকের ন্যায় তাঁরা ফুলে উঠ্‌ছেন। আর কিছুতে ভ্রূ-ক্ষেপ নেই।

আসলে জনগণের প্রতি তাঁদের কোন শ্রদ্ধা নেই। গান্ধী বলেছেন : জনগণ যদি 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' না বলে আমার মুখে থুতু দিত, অথচ আমার কথা মত কাজ কর্তো আমি খুশী হতুম। আমি যে জনগনের কাজে যাই সেটা তারা আমাকে কিছু শেখাবে বলে নয়। কিন্তু জনগণ হচ্ছে সমুদ্রের জলের ন্যায়। এ জল খাওয়া যায় না, কিন্তু, তার হাওয়া স্বাস্থ্যপ্রদ। আমি জনগণের সঙ্গে মিশে বুঝতে পারি আমাকে কি কর্তে হবে।

অথচ, জনগণের সমক্ষে কি রূপ কর-জোড় হয়ে কি বিপুল বিনয় ও শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর সাফল্যের কুঞ্জিকা। আমাদের নূতন বুদ্ধিজীবীদের অবশ্য এ রকম কোন অভিজ্ঞতা নেই।

দেশে প্রয়োজন কর্মের। কারণ, কর্ম ছাড়া কোন সংকট উত্তরণ, কোন কিছু গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

কিন্তু, যদিও আমাদের নূতন বুদ্ধিজীবীদের ধ্বনি দিয়ে ডালের উৎরাণ শান্তি কর্তে ব্যর্থ হয়েছেন, তথাপি কর্মে তাঁদের কোন শিক্ষা-দীক্ষা-নেই। অবশ্য, নিয়ম হলো : আপনি আচরি ধর্ম পরকে শিখায়।

Scanned with CamScanner

গান্ধী যখন মুখে বক্তৃতা কচ্ছেন হাত দিয়ে সুতো কাটতেন। বলতেন: এই দেখ, মুখে কথা বলি হাতে কাজ করি। কংগ্রেসের চাঁদা হলো মাসে চার আনা। এটা তোমরা নগদে দিওনা, চার আনা পরিমাণ সুতা কেটে দিও।

লোকে ভাবলে: অনেক নগণ্য কাজ! কিন্তু, এই নগণ্য কাজ দিয়েই মাঞ্চেষ্টার ও ল্যাঙ্কাশায়ারে আতঙ্ক সৃষ্টি করা সম্ভব হলো: ভারতে কাপড় রফতানী স্তিমিত হয়ে গেল কেন? পরে মাঞ্চেষ্টার-গার্ডিয়ান ভারতের স্বাধীনতা দাবীর সমর্থক হয়ে পড়ে।

বন্যা ও দুর্ভিক্ষের কবলে বাংলাদেশ যে এমন ভাবে মার খেল এই সংকটেও কিন্তু আমাদের নূতন বুদ্ধিজীবীদের কর্মতৎপর হতে দেখা যায় নি। তাঁদের দেখা গিয়েছে ত্রাণ-কার্যের কো-অর্ডিনেটর অর্থাৎ সমন্বয়কারী হতে। অর্থাৎ, হস্তক্ষেপের অধিকার। ঐ পথে শক্তি, ঐ পথে লাভ।

নূতন বুদ্ধিজীবীরা নিজেরা কর্মী না হওয়াতে সরকারের অনুকূলে কোন কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি করতে পারেন নি। অথচ জনসাধারণের কর্মোদ্যোগ ও সহযোগিতা ছাড়া কোন সরকারই সাফল্যের আশা করতে পারে না।

আমাদের নূতন বুদ্ধিজীবীরা অনেকেই ব্যবসায়ী হয়ে পড়েছেন এবং ব্যবসা উপলক্ষেই সুযোগ সন্ধান করে আর্থিক দিক দিয়ে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়ে গেছেন। কিন্তু রাষ্ট্র-গঠনে অথবা প্রশাসনকে জাতীয় লেভেলে দাঁড় করানোর ব্যাপারে তাঁদের কোন চেষ্টা আছে কি?

পাকিস্তান আমলে আয়ুব খাঁর শাসনতন্ত্র কমিশনের চেয়ারম্যান জাষ্টিস শাহাবুদ্দীন আমাকে পরীক্ষা কচ্ছিলেন চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে:

প্রশ্ন: ভোটারের লেখা-পড়ার যোগ্যতা সম্বন্ধে আপনার মত কি?

আমি: লেখা-পড়া জানার কোন অপরিহার্য প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: (অবাক হয়ে) লেখা-পড়া না জানলে ভোটার তার দায়িত্ব পালন করবে কি রূপে।

Scanned with CamScanner

আমি ঃ দেখুন, আমার বাবা সমাজ-পতি মানুষ। তিনি ইংরেজী লেখা-পড়া জানেন না। কিন্তু, তাঁর ছেলেকে (আমাকে) ইংরেজী পড়িয়েছেন। যখনই ইংরেজীর আশ্রয় গ্রহণ কর্তে হয় তিনি আমার সাহায্য নেন। আর, তিনি জানেন যে আমি তাঁকে ঠকাবো না।

প্রশ্ন ঃ নিরক্ষর লোক মন্ত্রী হবে কি করে?

আমি ঃ সাক্ষর লোকদের মধ্যে যেমন বহু পাজী লোক আছে নিরক্ষর লোকদের মধ্যেও তেমনি বহু পারগ লোক আছেন। লেখা-পড়া জানা লোকেরা যদি তাকে সৎভাবে সাহায্য করেন নিরক্ষর গুণী লোকের মন্ত্রী হতে দোষ কি?

প্রশ্ন ঃ এ কথা কে বলেছে?

আমি ঃ মহাত্মা গান্ধীরও এই মত ছিল।

গান্ধীর নাম শুনেই জাষ্টিস শাহাবুদ্দীন যেন জ্বলে উঠলেন। আমারও হুঁশ হলো একজন পাকিস্তানী অফিসিয়েলের নিকট গান্ধীর নাম করা ঠিক হয় নি। যাহা হোক; আমাদের বৈঠক হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। তবে, আমার ঐ মত এখনও অনড় রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসায়ীরা এবং জনসাধারণ মুনাফার এবং জীবিকার কাজ সপ্তাহে পাঁচ দিন। শনি ও রবিবার তাদের বন্ধ। এই দুই দিন পরম আগ্রহে তারা দেশের কাজ করে। এর মধ্যে প্রধান হলো এমন সব কাজ যে গুলি বেসরকারী লোকেরা সুষ্ঠু ভাবে কর্লে সরকারের বোঝা ও দায়িত্ব অনেক হাল্কা হয়ে যায়। এতে সরকারের ব্যয়ও অনেক কমে যায়।

এই সব কাজ করার জন্যে ব্যবসায়ীরা চাঁদা করে বড় বড় সংস্থা গড়ে তুলেছেন, উপযুক্ত লোককে তার ডিরেক্টর নিযুক্ত করেছেন, তার যাবতীয় ব্যয় নিজেরা নির্বাহ করেন এবং বন্ধের দিনে নিজেরাও তাতে কাজ করেন।

Scanned with CamScanner

আমাদের নূতন বুদ্ধিজীবীরা ভাবেন যে সরকার রয়েছে তাঁদের লাইসেন্স ও পারমিট জোগাতে। এগুলো বাগিয়ে নিয়ে তাঁরা তিলকে তাল করবেন, কিন্তু সরকারের প্রতি তাঁদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

দেশ স্বাধীন হওয়ার মানে শোষণ থেকে জন-সাধারণের সত্য সত্যই মুক্তি লাভ। কিন্তু, এখন যখন শোষণ অবাধ ও ব্যাপক হয়ে গেছে - কি করে বলি যে দেশ স্বাধীন হয়েছে ?

বরং, মনে হয়, আমাদের পার্টিজান' বা দলীয় অবস্থা চলছে।

রাশিয়ায় এবং চীনে উদ্যোগ জন-সাধারণের হাতে ফিরে আসার পূর্বে এরূপ 'পার্টিজান' অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তাদের সঙ্গে লড়াই করে জন-সাধারণ স্বাধীন হয়।

চীনে বিদেশীদের 'ক্যাপিচুলেশন' আধিপত্যের পর দেশ চার জন নেতা ভাগ করে নেন--চিয়াং-কাইশেক, চেং-সোলিনা, ওয়া-পেই ফু এবং ফেঙ্গুশিয়ান। এদের বলা হতো 'ওয়ার-লর্ড'। মাও-সেতুং-এর নেতৃত্বে কম্যুনিষ্টরা এদের আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে দেশকে স্বাধীন করে। তবে; চিয়াং-কাই-শেক এখনও তাইওয়ানে টিকে আছেন।

'পার্টিজান অবস্থার কতকগুলি আলামৎ আছে ঃ

১ শোষণ অবাধ ও ব্যাপক হবে। দেশের প্রতিভা নিয়োজিত হবে নূতন নূতন লোক কর্তৃক শোষণের নূতন নূতন পন্থা উদ্ভাবনে মানুষ আত্ম-সর্বস্ব হবে। মানবীয় উদারতা লোপ পাবে।

লবনের ইতিহাস

আমরা লবন সমুদ্রে বাস করি। ইতিহাসে দেখা যায় ঃ এক কালে বাংলাদেশ থেকে য়ুরোপে প্রতি বৎসর দুইশত জাহাজ লবন রফতানী হোত।

সেই বাংলা দেশ তথা ভারতবর্ষ যখন বৃটিশের কর্তৃত্বে এলো ওরা এই দেশে লবন প্রস্তুত নিষিদ্ধ করে দিল। জাহাজ খালি আসতো এদেশ থেকে

Scanned with CamScanner

কাঁচা মাল নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তারা নিয়ম কর্ল: জাহাজ খালি আসবে না, লবন নিয়ে আসবে।

এই অবস্থা লক্ষ্য করে কবিবর নবীন চন্দ্র সেন ক্ষোভ করে লিখলেন: লবনাম্বুরাশি বেষ্টিত যে স্থল, জনমে লিবারপুলে লবন তাহার!

গান্ধী এই ব্যবস্থাকে নাম দিয়েছিলেন 'নিষ্ঠুর মনোপলি' এবং এক পর্যায়ে ডান্ডিতে লবন সত্যাগ্রহ দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উদ্বোধন করেছিলেন।

লবন ভারতে পাচার হয় না।

তবুও ন্যায্য মূল্যের দোকান দিয়ে বাংলাদেশে লবনের সরবরাহ বজায় রাখতে হয়েছে। নতুবা, আভ্যন্তরীন বাজারেই কোথা কোথাও এর দর উঠেছে নাকি সের বত্রিশ টাকা!

২ কর্তা-ব্যক্তি হাতে বেপরোয়া ক্ষমতা গ্রহণ কর্বেন।

৩ স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারীদের মনোবল ও নীতি-বোধ ভেঙ্গে পড়বে। তারা এবং পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এজেন্সী-সমূহ 'তুমি আইন রাখলে, আইন তোমাকে রাখবে' নীতি ভুলে যাবে। বরং তারা 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতিতে কর্তা-ব্যক্তি বা পার্টিজান'দের ইচ্ছামত কাজ করতে ব্যগ্র হয়ে পড়বে।

৪ দ্রব্য-মূল্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে অক্ষম হয়ে গরীবেরা পথে-ঘাটে থাক্‌বে আর ঠিক সে সময়ে পার্টিজানরা আর প্রশাসন এক-জোট হয়ে নিজেদের জন্যে সুযোগ ও সুবিধাবাদী নীতি (দুর্নীতি) চালিয়ে যাবে।

৫ শিক্ষার অঙ্গন দুর্নীতি দ্বারা কলঙ্কিত হবে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয় এবং ছাত্র-শিক্ষক, পরিচালকবর্গ সর্বত্র এবং সকলের মধ্যে দুর্নীতি প্রসার লাভ কর্বে।

Scanned with CamScanner

৬ উৎপাদন কমে যাবে। কারণ, সনদী বিশেষজ্ঞদের অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী দেখে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হবে। দেশে সহজাত প্রতিভা নিরক্ষর ও স্বীকৃতিবিহীন বলে তাদের পাত্তা দেয়া (যেমন দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ায়, বিপ্লবের পর) হবে না। আর, সনদী বুদ্ধিজীবীরাই প্রথম একচোট নিজেদের শোষণ চালাতে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত করে।

৭ 'পার্টিজান'রা সবরকম বিরোধীতা ও সমালোচনাকে কাজে, লেখায় ও কথায় অসম্ভব করে তুলবে। কিন্তু তবুও নূতন নূতন দলের অভ্যুদয় বন্ধ থাকবে না।

৮ দেশে 'শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যারা 'অনুপার্জিত আয়' ভোগ করে তাদেরই প্রতিষ্ঠা হবে।

৯ ব্যর্থতাবোধ ও নৈরাজ্যের ভাব দেশে নানারূপ দুষ্কর্মের যাদের জন্ম দেবে যার প্রধান—নায়ক হবে যুব-শ্রেণী। গুন্ডাদের হবে পোয়া বারো।

১০ নির্বাচন খাঁটি ও অপক্ষপাত হবে না। কারণ, স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারীদের নৈতিক বল এত ভেঙ্গে পড়বে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার বাইরে তারা আইন মাফিক কাজ করবার সাহস পাবে না।

১১ অর্থনৈতিক—বিশেষতঃ দ্রব্য-মূল্যের ক্ষেত্রে চোরা-বাজারই হবে নিয়ন্ত্রক, সরকার নয়। সরকার 'কন্ট্রোল রেইট' বাড়াতে বাড়াতে চোরা-বাজারের প্রায় সমান করে তবেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু এই রেইট দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

বহু রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হবে বটে, কিন্তু দল পরিবর্তনে দেশের অবস্থার কোন সুরাহা হবে না কারণ রাজনীতির প্যাটার্ণ অধিনতা যুগের ন্যায়ই রয়ে গেছে—যখন ধ্বনি বা শ্লোগান দেওয়াই ছিল একমাত্র কাজ এবং শাসন-ক্ষমতা দখলই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

৬ উৎপাদন কমে যাবে। কারণ, সনদী বিশেষজ্ঞদের অর্থাৎ বুদ্ধিজীবী দেখে কর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হবে। দেশে সহজাত প্রতিভা নিরক্ষর ও স্বীকৃতিবিহীন বলে তাদের পাত্তা দেয়া (যেমন দেওয়া হয়েছিল রাশিয়ায়, বিপ্লবের পর) হবে না। আর, সনদী বুদ্ধিজীবীরাই প্রথম একচোট নিজেদের শোষণ চালাতে গিয়ে উৎপাদন ব্যাহত কর্বে।

৭ 'পার্টিজান'রা সবরকম বিরোধীতা ও সমালোচনাকে কাজে, লেখায় ও কথায় অসম্ভব করে তুলবে। কিন্তু তবুও নূতন নূতন দলের অভ্যুদয় বন্ধ থাকবে না।

৮ দেশে 'শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না। যারা 'অনুপার্জিত আয়' ভোগ করে তাদেরই প্রতিষ্ঠা হবে।

৯ ব্যর্থতাবোধ ও নৈরাজ্যের ভাব দেশে নানারূপ দুষ্কর্মের যাদের জন্ম দেবে যার প্রধান—নায়ক হবে যুব-শ্রেণী। গুন্ডাদের হবে পোয়া বারো।

১০ নির্বাচন খাঁটি ও অপক্ষপাত হবে না। কারণ, স্থায়ী প্রশাসনিক কর্মচারীদের নৈতিক বল এত ভেঙ্গে পড়বে যে ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার বাইরে তারা আইন মাফিক কাজ করবার সাহস পাবে না।

১১ অর্থনৈতিক—বিশেষতঃ দ্রব্য-মূল্যের ক্ষেত্রে চোরা-বাজারই হবে নিয়ন্ত্রক, সরকার নয়। সরকার 'কন্ট্রোল রেইট' বাড়াতে বাড়াতে চোরা-বাজারের প্রায় সমান করে তবেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে। কিন্তু এই রেইট দেশের অধিকাংশ জনসাধারণের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে।

বহু রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয় হবে বটে, কিন্তু দল পরিবর্তনেও দেশের অবস্থার কোন সুরাহা হবে না কারণ রাজনীতির প্যাটার্ণ অধিনতা যুগের ন্যায়ই রয়ে গেছে—যখন ধ্বনি বা শ্লোগান দেওয়াই ছিল একমাত্র কাজ এবং শাসন-ক্ষমতা দখলই ছিল একমাত্র লক্ষ্য।

Scanned with CamScanner

এই প্যাটার্ণ চলতে থাক্‌লে দল পরিবর্তন হলেও জন-সাধারণের কোন উপকার বা প্রকৃত মুক্তি হবে না।

একজন সাধারণ লোকের এক চমৎকার প্রতিক্রিয়া দেখেছিলাম এক নির্বাচনের প্রাক্কালে। আলাপটা হয়েছিল নিম্নরূপ ঃ

আমার প্রশ্ন ঃ এবার কাকে ভোট দিচ্ছ ?

উত্তর ঃ আমার মত যদি জিগ্যেস করেন, তবে বলি, নির্বাচনেরও প্রয়োজন নেই, সরকার পরিবর্তনেরও কোন দরকার নেই।

প্রশ্ন ঃ কেন ?

উত্তর ঃ এই সরকার তো গদীতে কয়েক বছর থাকল, খেতে খেতে পেট আকন্ঠ পুরেছে, আর খাওয়ার জায়গা নেই। আর ভাই-বেরাদরা যত আছে সকলেরই একটা সুরাহা করে ফেলেছে, আর কেহ বাকী নেই যে তার জন্য কিছু করতে হবে। এবার হয়তঃ আমাদের জন্য কিছু কর্বে।

কিন্তু এদের বদলে নূতন লোক আনলে অবস্থা হবে এই যে, ওরা আবার নিজেদের পেট পুরা কর্তে এবং নিজেদের ভাই-বেরাদের সুরাহা কর্তে লেগে যাবে। তা হ'লে আমাদের পালা কখন আস্‌বে ?

বুদ্ধিজীবীরা এ দেশের সাধারণ লোকদের যেখানে রেখেছেন তাতে এরূপ একটা বিশ্লেষণের জন্যে তার তারিফই কর্তে হয়। এর সঙ্গে আপনার মত মিলুক আর না মিলুক আপনি একটা সিদ্ধান্ত অস্বীকার কর্তে পারেন না। সেটা এই যে যে-দল যখনই ক্ষমতায় গিয়েছে তারা ঠিক পূর্ববর্তীর ধরণেই কাজ করেছে। একইভাবে ঘাঁটি রক্ষা—তার কৌশলগুলিকে বরং উত্তরোত্তর কঠোর করা—কালাকানুনকে আরও এক ছোপ কাল করে দেওয়া—ইহাই চলে এসেছে দেশের ইতিহাসে।

একজন সাধারণ লোককে জিগ্যেস করুন। সে বল্‌বে যে সে সব চেয়ে সুখী ছিল বৃটিশ আমলে। তারপর আমলও বদ্‌লেছে তার দুঃখও

Scanned with CamScanner

ক্রমে ক্রমে বেড়ে গেছে। এ জন্যে বুদ্ধিজীবীরাই দায়ী—যাঁরা শাসনের গদীতে বসেছেন এবং জন-গণের উপর শাসন ও শোষণ চালিয়ে এসেছে।

ম্যাজিক শব্দ যা অবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে তা হলো 'কাজ'। যুক্তরাষ্ট্রে দেখেছিঃ সকালে লোক যখন কাজে বেরোয় এবং বিকালে ফিরে—পুরুষ স্ত্রী-লোক এক সঙ্গে—ঠিক যেন পিপড়ের সারি চলেছে—কোন রূপ যতি ভঙ্গ নেই, হৈ-চৈ নেই—চলার সে কি পূর্ণতা, সে কি শৃঙ্খলা !

আমাদের দেশে আয়ুব খাঁর আমলে শহরে বন্দরে এরূপ কিছু কাজ শুরু হয়েছিল—কিন্তু, সেটা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি।

দেখেছি—তাদের চেহারা দিয়ে পোষাকে পরিচ্ছদে, চলনে-বলনে শুরু ফুটে উঠছে কাজ আর কাজ।

অধীনতা যুগের যে আন্দোলন-ধর্মী রাজনীতি এদেশে চলে এসেছে, এখনও চলছে—যার বাহন ছিল ধ্বনী—সেটাকে বদলে ফেলে কর্ম-ভিত্তিক কর্তে হবে।

এ দেশে বুদ্ধিজীবীরা শাসন ও শোষণ চালিয়ে এসেছে—কিন্তু নিজের হাতে কাজ না করে অপরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছে।

বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের দেখেছে অবসর-ভোগী নিজে-না-খাটা, পরের শ্রমের ফলের উপর ভাগ-বসানো তথা-কথিত 'সুখী' মানুষ রূপে। বস্তুতঃ, তাদের লেখা-পড়াই তাদের অভিশাপ।

আমি নিজেকে 'বুদ্ধিজীবী' (যে অর্থে আমাদের দেশে এটা প্রযুক্ত হয় ভাবতে ঘৃণা করি। আমি এবয়সেও পায়ে হেঁটে বেড়াতে ভালবাসি এবং নিজের গাঁটরী (যার ভিতর থাকে প্রধানতঃ লিখবার সরঞ্জাম ও পড়ার বই) নিজে বওয়াই পছন্দ করি। তার প্রধান কারণঃ আমি এদেশের মাটির সন্তান এবং এই মাটিতে বুক দিয়ে যারা বাঁচছে-মরছে আমি তাদেরই একজন। (যাঁরা 'তাজিয়া'য় আমার 'আনব্যালেন্সড' গল্পটি পড়েছেন তাঁরাই আমার মনের খবর জেনেছেন।)

Scanned with CamScanner

আমাদের চেহারা চরিত্রে 'কাজ' নেই। অফিসে আদালতে কোন 'কাজ' হয় না। অথচ, এই উর্বর মাটিতে আমাদের অজস্র সম্পদ পানিতে কাজে লাগিয়ে আমরা সাত কোটি লোকের চৌদ্দ কোটি হাত কি না কর্তে পারি !

কিন্তু, বুদ্ধিজীবীরা এই দেশের হাতগুলোকে বহু পূর্বেই মেরে রেখেছেন। এটা একটু সবিস্তার বলার প্রয়োজন দেখছি।

মানুষ প্রকৃত মানুষ পদবাচ্য হয় তখন যখন তার শিক্ষা ও অভ্যাস এই পর্যায়ে পেঁছে যে যে কোন পরিস্থিতিতে তার দেহ-মন সর্ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দিয়ে প্রতিক্রিয়া করে। এর প্রমাণ বিশেষ করে পশ্চিমা জাতিগুলো। আমি লক্ষ্য করেছি যুক্তরাষ্ট্র সফরের সময়।

তাদের শুধু যে হাত আছে তা নয়, কিন্তু যান্ত্রিকতার মাধ্যমে তাদের হাতের সংখ্যা দুটারও উপর বাড়িয়ে নিয়েছে।

একটা পথের দৃশ্য বলি। যেখানেই মোটর বিকল হলো সেখানেই আরোহী (পুরুষ বা মেয়ে) গাড়ীর তলায় শুয়ে পড়ে তার সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করে সেটা সারাতে লেগে গেল এবং শেষ পর্যন্ত সারালও। এরূপ যে কোন পরিস্থিতিতেই গোটা মানুষটি প্রতিক্রিয়া করে আর সব বিদ্যাও যেন তার নখ-দর্পণে।

আর, আমাদের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা দেখুন। আমাদের হাত লিখতে এবং চোখ পড়তে অভ্যস্ত বটে, কিন্তু তার বাইরে তাদের কিছু জানা নেই, তারা একান্ত অসহায়।

নওয়াব সিরাজদ্দৌলা এজন্য দানা শা ফকিরের নিকট ধরা পড়েছিলেন যে তাঁর জুতা বদলে দেবার জন্য খিদমৎগার কাছে ছিল না, তিনি নিজে তো আর জুতো বদলাতে জানেন না, সুতরাং বহুমূল্য জুতা পায়েই পালাতে লাগলে আর সেই জুতা দেখে দানা শা ঠিকই আঁচ করে নেয় যে এ নবাব না হয়ে যায় না।

Scanned with CamScanner

তিন হাত পানিতে নৌকা ডুবে আমাদের বুদ্ধিজীবীরা মারা গেছেন এ রকম কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। কারণ, উপর দিকে হাত তুলে দেখার কিনা তো তাঁর জানা নেই।

১৯২১ সালে আমি যখন সব্-রেজিস্ট্রার হয়ে সরকার চাকুরীতে ঢুকি তখন ঐতিহ্যবাহী এক বংশের এক ভদ্রলোক প্রায়ই আমার নিকট কবলা রেজিস্ট্রি করাতে আসতেন। তিনি অত্যন্ত দরিদ্র দশায় পড়েছিলেন। ভিটে বাড়ির দরাজাটা পর্যন্ত বিক্রী করে দিচ্ছিলেন। ওদিকে নাম দস্তখত কর্তেন আরবীতে আর যখনই অফিসে আসতেন এক চাকর তাঁর অনুগামী থাকতো।

একদিন তোরাব আলী মিঞার আমার সঙ্গে আলাপ হলো। বল্লেন: আপনির সবই ভাল, কিন্তু নিজের ছাতা নিজে বহন করেন এটা বড়ই আপত্তিজনক।

আমি নিবেদন কর্লুম: কি কর্তে হবে?

বল্লেন: সঙ্গে একজন চাকর থাক্‌বে। কোন কিছু বইতে হয় সে-ই সে কাজ কর্বে। ভদ্র লোকের ছেলে যদি ছাতা বইতে হয় তার ভদ্রতার কিছু অবশিষ্ট থাকে?

এক সময়ে আমাদের বুদ্ধিজীবীরাই এই ফর্মুলা বের করেছিলেন যে যাতে কাজ কর্লে 'বুদ্ধিজীবী'দের শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হয়ে যায়—ব্রাহ্মণ তার ব্রাহ্মণত্ব, সৈয়দ তার সৈয়দত্ব হারায়।

ফলে তাদের—আমাদের বুদ্ধিজীবীদের হাত মরে গেছে। যাদের হাত মরে যায় তাদের মাথা হয়ে উঠে শয়তানের কারখানা। এখন আমাদের হয়েছে সেই দশা। 'পার্টিজান' অবস্থায় আমরা শয়তানের কারখানার যুগে বাস করছি।

এই পরিণতি আমাদের প্রাচীনদের জানা ছিল। এটা এড়াবার জন্যে তাঁরা ব্যবস্থাও গ্রহণ কর্তেন।

Scanned with CamScanner

(বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত ঃ দ্বিতীয় পর্যায়)

সঙ্কটের চেহারা

—মাহবুব-উল আলম

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ প্রধান ব্যাস সিংহ ও বারেন্দ্র প্রধান ভৃগু নন্দী বল্লাল সেনের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন। উভয়েই বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করায় তিনি ব্যাস সিংহকে করাত দিয়ে চিড়ে ফেলবার ও ভৃগু নন্দীকে বন্দী করবার আদেশ দেন। ব্যাস সিংহের নিধন ঘটেছিল বলেই মনে হয়। কিন্তু, ভৃগু নন্দী বল্লালের অধিকার থেকে পলায়ন করতে সক্ষম হন।

বারেন্দ্র কায়স্থ্য বৈদ্য ও বৈদিক ব্রাহ্মণ এই তিন সমাজ বল্লালের কুল-মর্যাদা স্বীকার করেন নি। নন্দী তাঁদের সাথে জুটে যান।

তবে, ভৃগু নন্দী যে কারণে বল্লালের বিরোধীতা করেন উহাই ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বল্লালী ব্যবস্থায় অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থের জল 'অচল' গণ্য হলেও তিনি কৈবর্তগণের জল 'চল' রেখেছিলেন দিব্যোয় নেতৃত্বে তাদের সফল বিদ্রোহের কথা স্মরণ করে। ভৃগু নন্দী কৈবর্তগণের প্রতি এই পক্ষপাতিত্ব স্বীকার করে নেননি।

১০৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে বল্লাল সেন গোবিন্দ পালকে পরাজিত করে গৌড় মগধ তাঁর রাজ্যভূক্ত করে নেন। অভিষেক উৎসবে তিনি ব্রাহ্মণ্য-বাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে তাঁর অধিকারভূক্ত জনপদসমূহে বৌদ্ধ ধর্ম এখনও প্রবল রয়েছে তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ থাকলেও তাঁরা ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করেন না, তাঁহারা বরং বিদ্বেষী যাহাতে সর্বত্র ব্রাহ্মণ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণ-

Scanned with CamScanner

বিদ্বেষীর উপযুক্ত দন্ড হয়, উহা লক্ষ্য রাখিবার জন্য তিনি গৌড়দেশে ১০০, মগধে ৫০, ভোটে (তিব্বতে) ৬০, রসীঙ্গে (আরাকানে) ৬০, উৎকলে ২২ এবং মৌড়ঙ্গে (আসাম ও তরাই) ২২ জন ব্রাহ্মণ স্থাপন করেছিলেন। বল্লাল সেন তান্ত্রিক দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে গুরু ব্রাহ্মণ সমাজকে পূর্ব পুরুষ অপেক্ষা সমধিক পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত করলেন। আজও যে সমগ্র বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণগণ সমাজের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত ও সর্বত্র পূজিত হচ্ছেন বল্লাল সেনের সময় থেকেই সেই গুরু বা বিপ্র পূজার প্রতিষ্ঠা"। "বৌদ্ধ সমাজ ত্যাগ করে যে নয় জাতি প্রথমতঃ বল্লালী পদ্ধতি ও ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্বীকার করলেন, তাঁরাই 'নবশাখ' বলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

ইতিমধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠিত কুলীনদিগের মধ্যে পদ-মর্যাদা নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হয়েছিল, বিশেষতঃ বিবাহের বেলায়। তিনি সাত জনকে 'সম' অর্থাৎ সমান ঘর বলে ঘোষণা করে ইহা মিটায়ে দিয়েছিলেন। ইহা প্রথম 'সমীকরণ' নামে পরিচিত।

বল্লাল সেন অসবর্ণ বিবাহ নিষেধ করে দেন। ব্রাহ্মণের আধিপত্য ছিল জন্মগত। কুলীনদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজ বিধানের উপর। এরা উচ্চ। পড়া-লিখায় এদের একচেটিয়া অধিকার স্বীকৃত হলো। নীচ জাতগুলির জন্য পড়া-লিখা নিষিদ্ধ হলো। উচ্চ জাতগুলির অধীন হয়ে থাকা ছাড়া মানুষের অধিকার নিয়ে তাদের বেঁচে থাকবার কোন উপায় থাকলোনা। পড়া-লিখার উপর নির্ভরশীল একটা তথাকথিত 'বুদ্ধিজীবী' সমাজের অথবা ভদ্র লোক শ্রেণীর উদ্ভব হলো। সমাজ-দেহে মস্তিষ্ক ও শ্রম পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়লো।

বল্লালী বিধানের আসল অঞ্চল রাঢ়। যাঁরা এই বিধানের বিরোধী হলেন তাঁদের নিরাপদ আশ্রয় হলো বাংলাদেশ—'যেখানে ঝড়-জলের কখন বিশ্রাম নেই'। ১১৩৯ খৃঃ অব্দেই আমরা দেখতে পাই যে দত্ত বংশের এক পূর্ব পুরুষ অনন্ত দত্ত শ্রীকন্ঠ নামক গুরুদেবের সাথে বল্লালের ভয়ে বঙ্গাল দেশে পালিয়ে এসে আধুনিক ময়মনসিংহ জেলার অষ্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বসতি স্থাপন করেছিলেন। বল্লালী রাজত্ব থেকে বহু হিন্দু পালিয়ে এসে চট্টগ্রাম জেলায় পড়ইকোড়া, নয়াপাড়া, কেলীসহর সুচক্রদন্ডী, ধলঘাট, ডেঙ্গাপাড়া, চক্রশালা প্রভৃতি গ্রামে আশ্রয় নেন।

Scanned with CamScanner

এই সমস্ত গ্রামে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ বিস্তর আছেন। কিন্তু, তাঁদের মধ্যে বল্লালী প্রথা প্রচলিত নেই।

বল্লালের পর তৎপুত্র লক্ষণ সেন মগধ, গৌড় রাঢ় ও বঙ্গে ১১৬৯ থেকে ১১৯৯ খৃঃ অঃ এবং কেবল বঙ্গে ও উৎকলের কিয়দংশে ১১১৯ হইতে ১২০৫ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

বল্লার সেন প্রথম জীবনে পূর্ব পুরুষগণের ন্যায় শৈব ছিলেন। রাজা হয়ে তিনি বৌদ্ধ-তান্ত্রিক ধর্মে অনুরক্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু, ১১৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে গৌড়-মগধ জয়ের পর অভিষেকোৎসবে দেখা গেল যে তিনি আবার পূর্ব পুরুষগণের বেদ, স্মৃতি ও পুরানোদিত 'সনাতন' ধর্মের রক্ষক হয়ে পড়েছেন।

কিন্তু, লক্ষণ সেনের মধ্যে তান্ত্রিক ভক্তির কোন আভাস পাওয়া যায়না। তাঁর আধিপত্য কালে বৈদিক ব্রাহ্মণেরাই একপ্রকার সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণেতর সকল জাতির উপরই ব্রাহ্মণরা প্রতিপত্তি চালাচ্ছিলেন। বৈদিকেরা ধর্ম বা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের উপর যথেষ্ট অত্যাচার কচ্ছিল। সদ্ধর্মিগণের উপর যেন তাঁরা জিজিরা কর বসিয়ে ছিলেন। যাঁরা বৈদিকের ইচ্ছানুরূপ কর না দিত তাঁদের কষ্টের সীমা থাকতোনা। গৌড়েশ্বর কিন্তু তার প্রতিবিধানে মনই দিতেন না। খৃষ্টিয় ১২শ শতাব্দের শেষ ভাগে বৈদিকেরা মালদাহ অঞ্চলে যথেষ্ট অত্যাচার চালাচ্ছিল।

মগধ বৌদ্ধ বসতি প্রধান ছিল বলে অত্যাচার এখানে চরমে উঠে। ইহার প্রেক্ষিতে মগধ থেকে দলে দলে বৌদ্ধরা পালিয়ে এসে বঙ্গাল দেশে আশ্রয় নেয়। এইরূপে চট্টগ্রাম ও সন্নিহিত অঞ্চল বৌদ্ধ-অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। তবে, বুদ্ধের অহিংসা ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল বহু পূর্বে। অশোকের রাজত্বের (৩৬৩ থেকে ৩২৩ খৃঃ পূর্বাব্দ) পর শতবর্ষ মধ্যেই ২৩৫ খৃঃ পূর্বাব্দে শেষ মৌর্য রাজ বৃহদ্রথের মৃত্যু ঘটিয়ে প্রধান সেনাপতি পুষ্যমিত্র সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছিলেন। পুষ্যমিত্র ছিলেন বৌদ্ধদ্বেষী ও পরম ব্রাহ্মণ ভক্ত। যেখান থেকে অহিংসা ধর্ম ঘোষিত হয়েছিল, অশোকের রাজধানী সেই পাটলীপুত্রের বুকের উপর বসে পুষ্যমিত্র এক বিরাট অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে অহিংসা ধর্মের

Scanned with CamScanner

প্রতি তাঁর বিরুদ্ধতা ঘোষণা করেছিলেন। তবে, বৈদিক যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়া-কান্ড অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। এ কারণে জন-সাধারণের নিকট উহা গ্রহণীয় হয়ে উঠতে পারে নি।

সেন-রাজারা বিশেষভাবে গণক ব্রাহ্মণের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষণ সেনের জন্মকাল সমাগত হলে রাণী রামদেবী জ্যোতিষীগণকে আনালেন। তাঁরা খড়ি পেতে ঘোষণা করলেন, এখন প্রসব হল ফল বড় অশুভ হবে। তবে, দুই ঘন্টা পরে জন্ম হলে কুমার ৮০ বৎসর রাজত্ব করতে পারবেন। রাণী আদেশ করলেনঃ এই দুই ঘন্টা তাঁর পা দুখানি বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা হেট করে রাখা হউক। এইরূপে শুভ মুহূর্তের লাগাল পাওয়া গেল বটে, কিন্তু পুত্র প্রসব করেই রাণী প্রাণত্যাগ করলেন।

ব্রাহ্মণ-প্রভাব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল ঃ

(১) অপরাধ সম্বন্ধে ব্রাহ্মণগণ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য ভোগ করতেন। ব্রাহ্মণ যত গর্হিত অপরাধই করুন না কেন, তাঁর প্রাণদন্ড হতে পারতোনা। ব্রাহ্মণের প্রতি কোনরূপ শারীরিক শাস্তি বিধানও অবৈধ গণ্য হতো। ব্রাহ্মণের প্রতি চূড়ান্ত দন্ড ছিল শিখা কর্তন পূর্বক বিত্ত সহ তাঁকে রাজ্য থেকে বহিষ্করণ।

(২) সাক্ষ্য দিবার জন্য ব্রাহ্মণকে ধর্মাধিকরণে উপস্থিত করাবার কোন উপায় ছিলনা। ব্রাহ্মণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সাক্ষ্য দিলেও কোন মতে তাঁকে 'জেরা' করা যেতোনা।

(৩) অথচ, ব্রাহ্মণ-এর কেহ সামাজিক ও নৈতিক ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করলে ব্রাহ্মণদিগের ব্যবস্থা মত তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হতো অথবা দন্ড গ্রহণ করতে হতো।

(৪) ব্রাহ্মণেরা রাজাকে উপদেশ দানের অধিকার ভোগও করতেন।

(৫) তদুপরি গণক ব্রাহ্মণদিগের ভবিষ্যদ্বাণী।

Scanned with CamScanner

শীঘ্রই জ্যোতিষ—শাস্ত্রের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণেরা রটনা করতে লাগলেন যে দেশে যখন অধিকার (বিদেশী বা বিধর্মীর অধিকার) প্রতিষ্ঠিত হবে।

ইতিমধ্যে দিল্লীতে বিদেশী মুসলমানের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শীঘ্রই দিল্লীশ্বরের জনৈক সেনাপতি ইখতিয়ারুদ্দীন মোহাম্মদ (বিন বখ্‌তিয়ার খিলিজীও) মগধ (বিহার) অধিকার করে নিবেন। "এ সংবাদ জ্যোতিবিক উক্তির সমর্থন করলো। সেটা সমগ্র গৌড়-রাঢ়ে রাজপুরুষ ও সম্ভ্রান্ত প্রজাদিগের মধ্যে ভীতির মায়া করলো। দেবজ্ঞের কথায় বিশ্বাস করে অনেকেই জন্মভূমির মায়া সঞ্চার কর্লো,—অনেকে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নিল, কেহ কেহ উত্তরে সুদূর হিমালয় প্রদেশে কেহ বা দক্ষিণে কলিঙ্গে গিয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।"

ইখতিয়ারুদ্দীন মোহাম্মদ মগধ জয়ের পর গৌড় রাজ্য আক্রমণার্থ অগ্রসর হচ্ছিলেন। তখন গৌড়ের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ। তিনি এত দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন যে মাত্র ২৮ জন অশ্বারোহী অনুচর তাঁর সঙ্গে থাকতে সক্ষম হয়েছিলেন। নগর রক্ষীগণ অশ্ব-বিক্রেতা মনে করে তাঁকে গতিরোধ করলোনা তিনি অবাধে রাজবাটিতে প্রবেশ করে অতর্কিত ভাবে প্রহরীগণকে আক্রমণ করলেন।

রাজা লক্ষণ সেন দৈবজ্ঞের কথা শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন। কোনরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন নাই। প্রয়োজন হলে পলায়নের জন্য ঘাটে নৌকা প্রস্তুত রেখেদিলেন। তিনি আহারে বসেছিলেন। এখন হঠাৎ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে খিড়কী পথে বের হয়ে নৌকায় গিয়ে উঠলেন। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ।

লক্ষণ সেন বাঙ্গাল-দেশে বিক্রমপুরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে সেন বংশ ১২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন; তবে, ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পৃষ্ট পোষকের গৌরবে নহে। এবং অত্যন্ত আঞ্চলিক ভাবে।

বল্লাল সেন কর্তৃক মগধ-জয়ের পর সনাতনীদের উৎপীড়নে মগধ বৌদ্ধ শূন্য হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু গৌড় বঙ্গ জনসাধারণ ছিল বৌদ্ধ।

Scanned with CamScanner

ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে মুসলমান আক্রমণের সময় ধর্ম-সম্প্রদায় বা বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমানদের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।

বৌদ্ধ প্রাবনের দিনে বুদ্ধকে অবতার মেনে নিয়ে এবং বৌদ্ধ ধর্মকে সনাতন ধর্মের প্রকার-ভেদ স্বীকার করে নিয়ে যে আপোষ করা হয়েছিল এখন শকরাচার্যের হিন্দু পুনরুজ্জীবন আন্দোলনের ফলে তা ত্যাগ করা হলো। এখন নূতন একটা কারিকা প্রচারের ফলে দাবী করা হতে লাগলো যে হয় বৌদ্ধদেরও হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে হবে নতুবা অস্পৃশ্য হয়ে থাকতে হবে। ফলতঃ ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ-বলয় নিয়ে দেশগুলিতে একটা ভয়ানক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। কে কয়জন বৌদ্ধ হত্যা করেছেন উহা এক গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছিল ঃ

জন-সাধারণকে বলা হলো ঃ তোমরা যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর, রাজার সাথে একাসনে বসে খেতে পার্বে, এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উপাসনা কর্তে পার্বে। এবং শ্রেষ্ঠ মুসলমানদের ন্যায় 'খাঁ' উপাধি গ্রহণ কর্তে পার্বে কারও প্রতি কোন বৈষম্য মূলক আচরণ করা হবে না, সকলেই সমান ব্যবহার পাবে। যাকে চট্টগ্রামের কংগ্রেস-নেতা মহিম চন্দ্র দাস নাম দিয়েছিলেন জাতি-ভেদ জাতের বজাতি' জাতি-ভেদ জর্জরিত দেশে যেখানে জন-সাধারণ মানুষের সব অধিকার হারিয়ে মনুষ্যেতর জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছিল এবং বৈদিকগণের হাতে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ কচ্ছিল তাদের কানে এই বাণী শোনাল মহামুক্তির আহবান রূপে। ফলে দলে জন-সাধারণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ কর্তে লাগল। শীঘ্রই 'ঘটি' দেখা দিল সনাতনী প্রতীক এবং 'বদনা' ইসলামী প্রতীক রূপে। আপনি মেয়ের বাড়িতে বৈড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন তাদের বাড়িতে 'বদনা' লটকিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ, তারা মুসলমান হয়ে গিয়েছে।

ইখতিয়ারুদ্দীন মোহাম্মদ আক্রমণকারীর ভূমিকা পালন করেই থামলেন না। শাসন দন্ড গ্রহণ করে দেশ শাসন করতে লাগলেন। ইহার বিয়োগান্ত দিক এই ছিল যে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলো বটে, কিন্তু, উহার আসন হলো রাঢ় অঞ্চলে যেখানে সনাতনী ভাব ধারা খুব দৃঢ়-মূল এবং তথাকথিত বুদ্ধিজীবি সমাজ খুব প্রবল।

Scanned with CamScanner

জাতি-বিভাগের গোড়ার কথা হলো ঃ 'পুরুষ-পরম্পরায় যে বংশ যে কাজ করে এসেছেন, অথবা যে বংশ যেরূপ গুণের অধিকারী হয়েছে, সেই গুণ ও কর্ম তাঁদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে এসেছে। সেই স্বাতন্ত্রই 'বর্ণ'।

এইরূপে রাজকীয় লেখ্য-বিভাগে যাঁরা পুরুষানুক্রমে নিয়োজিত হলেন, কালে তাঁহারাই কায়স্থ আখ্যা লাভ করেন। সণাম নকল নিবাসী কেরাণীর কার্য থেকে রাজ্যাধিকরণের বা রাজ-সভার সান্ধি-বিগ্রহিকাদির কার্য পুরুষানুক্রমে তাঁদের একচেটিয়া বৃত্তি হয়ে পড়েছিল তাঁরই 'কায়স্থ'।

কায়স্থ কেবল লেখক নহেন, অতি প্রাচীন কাল থেকেই করাধ্যক্ষের (Revenue Officer) কাজ করে এসেছিলেন। তাঁদের হস্তে কারাধিকার থাকায় তাঁরা প্রজাগণের এক প্রকার দন্ড মন্ডের কর্তা ছিলেন। তাঁদের লেখনীর তাড়নায় যে কোন প্রজার সহজেই ভাগ্য বিপর্যয় ঘটতে পার্তো।

তবে, কায়স্থপদের এই কাজে ভাগ বসিয়েছিলেন বৈদ্যরা। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস 'তাঁহার বাংলা ভাষার অভিধান' এ বলেন 'ব্রাহ্মণ পিতৃক বৈশ্য-মাতৃক ঃ বৈদ্য জাতি।

ব্রাহ্মণের অশৌচ থাকে ১০ দিন বৈদ্যের ১৫ দিন, কায়স্থের ৩০ দিন। সুতরাং, ব্রাহ্মণের পর কায়স্থের পূর্বে বৈদ্যের স্থান।

দলে দলে জন-সাধারণ মুসলমান হলো বটে, কিন্তু দুটো জিনিস ইসলামের প্রতি চ্যালেঞ্জ হয়ে থাকল ঃ প্রতিমা-পূজা ও রাজ-সরকারে কায়স্থ বৈদ্যদের প্রাধান্য।

Scanned with CamScanner

নল থাকবে আকাশ মুখী

—মাহবুব-উল আলম

যুদ্ধ বিদ্যার কত অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এখনও সেনাবাহিনীর আসল অংশ হলো পদাতিক দল আর তার হাতে শ্রেষ্ঠ মারণাস্ত্র হলো বন্দুক। বন্দুকের যে পেটে গুলি ভরা হয় (অবশ্য হাতে নহে, কলে) তার নাম ম্যাগাজিন। ম্যাগাজিন থেকে নলের শুরুর অংশ চেম্বার। 'চেম্বারে গুলি আছে' ঃ এর অর্থ হলো গুলি উদ্যত হয়ে আছে ঘোড়া টিপলেই ফায়ার হয়ে যাবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের নানা অংশ থাকে। যে অংশটা সবচেয়ে গরম সেখানে বন্দুকে গুলি পোরা থাকে, এমন কি চেম্বারেও প্রস্তুত।

কিন্তু, কম গরম অংশে গুলি সর্বক্ষণ পোরা থাকে না। তবুও তো বলা যায়না, সৈন্যের হাতের বন্দুক—এজন্য প্রতি প্যারেডের শেষেই একটা প্রক্রিয়া আছে—যার নাম 'আনলোড'।

'আনলোড' এর পরে ধরে নেওয়া হয় যে বন্দুকে আর গুলি নেই। তাকে ভয় করবারও আর কোন কারণ নেই।

দুর্গা আর বিজয় একই তাঁবুর দুই বন্ধু। দিল্লেগী করতে দুর্গা বিজয়ের বুকে তাক করে বল্লে ঃ মারব এক গুলি। বিজয় হাস্‌তে হাস্‌তে বুক চিতিয়ে বল্লে ঃ মার্‌ দেখি। দুর্গা ঘোড়ায় হাত দিয়ে কসরৎ করতে বন্দুক গর্জে উঠল 'গুড়ুম'। গুলি বুক ভেদ করতেই আর্তনাদ করে বিজয় পড়ে গেল—পাথরের মত মৃত। সঙ্গে সঙ্গে দুর্গাও অচৈতন্য হয়ে পড়ে গেল।

Scanned with CamScanner

কোর্ট মার্শাল হলো। দুর্গার সাজাও হলো—২৮ দিন জেলে—যেটা মামুলী।

অভিজ্ঞ সেনাপতিরা বল্লেন: 'আনলোড' এ বল্টু পুরো না টানলে অনেক সময় এক আধটা গুলি ম্যাগাজিনে থেকে যেতে পারে।

তখন থেকে আদেশ হলো: নল আকাশ মুখী ছাড়া কোন অবস্থাতেই বন্দুক নাড়া-চাড়া করতে পারবেনা। এই আদেশে আমরা পোক্ত হয়ে গেলুম।

পল্টনে যাঁরা গিয়েছিলেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিদ্বান ছিলেন কুমার অধিরুম মজুমদার এম-এ-বি-এল, কলিকাতা হাই কোর্টের য়্যাডভোকেট। তাঁর উষ্মা হলো: তোমরা মুসলমানেরা কেন এলে? বাঙ্গালী পল্টনে মুসলমানও আসবে এটা যেন তিনি নিজেকে কিছুতেই বোঝাতে পাচ্ছিলেন না।

মুসলমানদের মধ্যে আমি ছিলুম সবে ধন নীল মণি' যে ম্যাট্রিক পাশ করেছে এবং কলেজের মুখ দেখেছে।

আশ্চর্যের বিষয়: অল্প দিনের মধ্যেই সুবেদার মজুমদার আমার দিকে ঝুঁকলেন। আমার লেখা-পড়া হলো তাঁর পরম নির্ভর। এর এটা লিখে দেওয়া, ওর ওটা লিখে দেওয়া আর তার বদলে আমার প্যারেড মাফ।

বিকেলের দিকে প্রায় অবসর থাকতো। আমি গিয়ে তাঁর তাঁবুতে বসতুম আর ডিসিপ্লিন বজায় রেখেও লেখাপড়ার জগতে সমানের ন্যায় তাঁর সঙ্গে মিশতুম। কোন কোন দিন ব্যাটালিয়ানের ডাক্তার কাপ্তেন জে আর ধর এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন।

কাপ্তেন ধর একদিন ফিট্ জেরাল্ডের 'ওমর খৈয়াম' নিয়ে আসলেন। আমাকে তাঁবুতে এনে সেটা পড়তে দিলেন। এটা এমন এক জিনিস যেটা আপনাকে পাগল করে দেবে।

Scanned with CamScanner

একবার মক্-ফাইট হচ্ছিল। এর গুরুত্ব ছিল আসল, যুদ্ধের মতই।

আমি ছিলাম সিগ্নেলার। সৈন্যদলের তিন এস্ বড় ভয়ঙ্কর। স্কাউট—যে পথ বের করে, সিগ্নেলার—যে সাঙ্কেতিক বার্তা প্রেরণ করে, স্নাইপার—যে বিপক্ষের ঘাটিতে ঢুকে পড়ে তার সেনাপতিদেরকে গুলি করে মারে। প্রত্যেককে প্রাণ হাতে করে কাজ করতে হয়। আর ধরা পড়লে নির্ঘাৎ শাস্তি মৃত্যু।

মণোরঞ্জন ছিল লুইস গানার। এই হালকা ক্যানন গুলো ছিল তখনকার সৈন্যদের হাতে সবচেয়ে মারাত্মক অস্ত্র। একবারে অনেক গুলি বের হয় আর সঙ্গে সঙ্গে উহাকে যে কোনদিকে সঞ্চালন করা যায় আমি আর মনোরঞ্জণ গতিকে এক জায়গায় পড়েছিলুম। তখন সামান্য বিরতি ছিল। মনোরঞ্জণ আমাকে তার কামানের সব কৌশল বুঝিয়ে দিচ্ছিল। আমার ট্রিগারে হাত ছিল। হঠাৎ দুই বন্ধুতে এমন স্থান-কাল-পাত্র উদ্দেশ্য ভুলে গেলুম যে মনোরঞ্জণ বল্লে ঃ এবার টেপ. আমি ট্রিগার টিপে দিলুম।

সঙ্গে সঙ্গে বিকট আওয়াজ করে ম্যাগাজিন একটা চক্কর খেয়ে গেল। সে আওয়াজে সকলে সচকিত হয়ে গেল, তার মধ্যে রয়েছেন বৃটিশ অফিসারগণ—যাঁরা সুবেদার মেজরের উপরেও কর্তা।

ভারী বিপদ। নির্ঘাৎ কোর্ট মার্শাল আর জবর শাস্তি।

ভাগ্য ভাল। মজুমদার ছিলেন কাছেই তিনি আমাদের দুজনকে এমন বকা-ঝকা করতে লাগলেন যে, বৃটিশ অফিসাররা চোখ তুলে দেখলেন এবং ভাবলেন যা করার সুবেদার করে ফেলছেন। তাদের আর কিছু করার প্রয়োজন নেই। মজুমদার বকা-ঝকা শেষ করলেন। এর বেশী কিছু ঘটতে দিলেন না।

আমাদের দুজনের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো ভাগ্যিস, ম্যাগাজিন ছিল খালি। ভরা থাকলে পল্টনের একটা অংশই উড়ে যেতো।

Scanned with CamScanner

বাড়ী এসে মনোরঞ্জন সন্ন্যাসী হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনে ঢোকে। তার-পর উভয়ের কোন যোগ নেই।

তবুও আর একটা ধকল বাকী ছিল। সেটা ঘটলো যখন বাড়ী এসে একদিন সেজে গুজে শ্বশুর বাড়ী গেলুম—যেতে বাধ্য হলুম।

শ্বশুর বাড়ীতে আমার এক দাদা শ্বশুর—শ্বশুরের চাচা ছিলেন অতি বিশিষ্ট লোক। ছেলে বেলায় রেঙ্গুনে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কালক্রমে এক ধনী বর্মিনীকে বিয়ে করেন নিজে বিখ্যাত ব্যবসায়ী হয়ে পড়েন—এখন শেষ বয়সে দেশে চলে এসেছেন। ছেলেপুলে হয়নি। বর্মিনী রেঙ্গুন ছেড়ে আসতে রাজী হননি, তবে সোনা-চাঁদি-হীরে-জহরৎ স্বামীকে ভাগ করে দিয়েছেন।

দেশে এসে নূতন দালান বাড়ী করেছেন। সাজ সরঞ্জাম দিয়ে ওটাকে সাজিয়েছেন আর কিনেছেন নূতন এক দোনলা বন্দুক।

খাওয়া দাওয়ার পর তিনি তাঁর বন্দুক আমার হাতে তুলে দিলেন। নাতিন জামাই যুদ্ধ ফেরৎ। বন্দুক হাতে না দিলে তার কদর হয় কিরূপে ?

ঘোড়ায় আমি হাত দিয়েছিলাম। বন্দুক দেখতে গেলে ঘোড়ায় হাত যাবেই। আর তিনি সামনে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে সব দেখাচ্ছিলেন। বল্লেন : ওই চেম্বারে গুলি নেই। তুমি ঘোড়া টিপতে পার।

কিন্তু টেপা মাত্রই বন্দুক গর্জে উঠল। উদগীর্ণ গুলি নল থেকে বেড়িয়ে দেওয়ালের পলেস্তারা খসিয়ে আকাশ পথে চলে গেল। তিনি অল্পের জন্য গুলি খাওয়া থেকে বেঁচে গেলেন।

সকলে 'হাঁ, হাঁ করে দৌড়ে এলেন। বুড়ো বল্লেন : আমারই ভুল। তবে, নাত জামাইয়ের মিলিটারী শিক্ষা। বন্দুকের নল আকাশ মুখী করেই ধরেছিলেন। তাই এই যাত্রা বেঁচে গেলুম।

Scanned with CamScanner

প্রধান অতিথি

—মাহবুব-উল আলম

সরকারের কি মতি হলো : এবারের 'একুশের পদক' দিয়ে আমাকে সম্মানিত কর্লেন। আর অম্‌নি নানা প্রতিষ্ঠান থেকে দাওয়াৎ আসা শুরু হলো তাঁদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হওয়ার জন্য। আমার রোখ চাপ্‌ল : শহর থেকে দূরে কোন মফস্বলে গিয়ে একদম হারিয়ে যাব। এমন সময় দাওয়াৎ নিয়ে এলো হিজল-ছড়ির নবারুণ সঙ্ঘের সেক্রেটারী; তাঁদের বার্ষিক অনুষ্ঠানে আমাকে প্রধান অতিথি থাক্‌তে হবে।

হিজলছড়ি অনেক দূর। তবে, তিনি আশ্বাস দিলেন; বত্রিশ বৎসর আগে আমি যে হিজলছড়িকে দেখেছি সে হিজলছড়ি এখন আর নেই। হিজলছড়িতে তিনতলা পাকা কম্যুনিটী সেন্টার নির্মিত হয়েছে। আর তাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। আরও বল্লেন : আমরা জীপে করেই আপনাকে নিয়ে যাব, জীপে করেই আপনাকে ফিরিয়ে দেব।

তাঁরা প্রধান অতিথির গলায় দুলহরী এক মালা পরিয়ে দিলেন—তবে ফুলের নহে, লাল কাগজের। আশি বছরের জীবন, মালা কি আর কম পরেছি! তবে, এ মালাটি আমার অপরিচিতও নয়, আবার নিজের গলায় কখনও একে অনুভব করেছি বলে মনে হ'ল না। ব্যাপার তা হ'ল কিটা হ'লো প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে আমি ভাবতে লাগলুম।

দেখে অবাক হলুম যে হিজলছড়ির মত দূর গণ্ডগ্রামেও বক্তৃতা রোগ বাঙ্গালীকে আক্রমণ করেছে। বক্তার পর বক্তা 'মাননীয় প্রধান

Scanned with CamScanner

অতিথি'কে তাঁদের বক্তৃতা শোনাতে লাগ্‌লেন। শুনতে শুনতে আমার মাথা শির শির কর্তে লাগ্‌ল। মনে হলো, মাথায় যেন দুখানা শিং বেরুবার উপক্রম। আল্লা, আল্লা—তাই যেন হয়, শিং বেরুলে শিং-নাড়া দিয়ে আমি এঁদের যে পলায়তি' কর্তে পার্তুম!

শিং সত্য সত্যই বেরুলোনা। কিন্তু, এর চেয়েও বড় দুঃসংবাদ নিয়ে এলো যখন জীপের ড্রাইভার এসে কানে কানে বল্লঃ হুজুর একটু তাড়াতাড়ি শেষ করুন। জীপের ব্যাটারী ডাউন হয়ে গিয়েছে, হাজীর হাটে পেঁছবার আগে তাকে 'চার্জ' করে নেওয়ার কোন সুযোগই হবেনা। হাজীর হাটও এখান থেকে অনেক দূর। তারপরও দশ মাইল পথ থেকে যাবে।

আমি বল্লুমঃ ব্যাটারীর আর দোষ কি? বক্তৃতার চোটে 'ডাউন' হয়ে গিয়েছে। সাম্‌নেই তো কম্পুটারের যুগ আস্‌ছে।

ড্রাইভার বল্লেঃ হাজীর হাটে প্রকান্ড গরু-হাটের কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। আজকে হাটবার। হাটবারে জীপ পার করাই হবে মস্ত এক ঝামেলা।

আমার মন কিন্তু আনন্দে নেচে উঠ্‌ল। সিলেটের নোয়াপাড়ার, কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জের, ময়মনসিংহের করটিয়ার গরু-হাটগুলির ছবি মনের চোখে ভেসে উঠ্‌ল। বড় ইচ্ছে করে বাংলাদেশের একটা গরু হাটা আবার এক নজর দেখ্‌তে।

তবুও বেশ দেরী হয়ে গেল। অবশেষে যখন রওনা হওয়া গেল তখন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘনায়মান। উদ্যোক্তাদের কিছু বলে লাভ নেই। কারণ, এই জীপের কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই।

আরো গেরো—আলোও ঠিক মত জ্বলছেনা। কার ঘাড়ে পড়িতো কার ঘাড়ে পড়ি অবস্থায় কোন মতে এগুতে লাগলাম।

Scanned with CamScanner

অনেক রাত্রে হাজীর হাট পেঁছে গেল। গরু বিকি-কিনি করে শেষ হয়ে গিয়েছে। মানুষ-জন নেই। গরুর দঙ্গল ও নেই। সব মশাল নিভে গেছে। মাঝে মাঝে দু'একটা মশাল এখনও জ্বলছে, কাছে কাছে দু'একজন লোক, দু'একটা গরু।

আর, হঠাৎ একটা ঝাঁকি দিয়ে জীপ থেমে গেল, তার আলো গেল নিভে। তার শব্দে একটা প্রকান্ড ষাঁড় শুয়ে-বসে জাবর কাটছিল, সেটা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ল।

ইয়া আল্লাহ! তার গলায়ও লাল কাগজের প্রকান্ড এক মালা—তবে, আমারটা দু-লহরী, তারটা তিন-লহরী, অনেক বেশী শোভন। সে সামনের এক পা তুলে বাড়িয়ে দিলে। বুঝলুম: এটাই তার হাত। আমি হাত বাড়িয়ে তার কর-মর্দন কলুম।

সে বল্লে: দেখছি আপনিও কোন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। ড্রাইভার মাঝখানে বাধা দিয়ে বল্লে: হুজুর, আপনাকে এবার নিজের যোগাড় দেখতে হবে। কারণ জীপ আর চলবেনা। দিনের বেলা তাকে ঘাঁটিতে নেয়ার কোন উপায় কর্তে হবে। আস্‌সালামু আলায়কুম!

ষাঁড় বল্লে: ভয় কি? আপনিও প্রধান অতিথি, আমিও প্রধান অতিথি। আমরা দুজনাই সমান। বন্ধু বলতে ও আমার আপত্তি নেই। তবে, ভাবছিলুম: মানুষ আবার কাগজের মালা ধরল কবে থেকে? ফুলের মালাই তো ছিল নিয়ত।

আমি বল্লুম: এককালে গরুদেরও ফুলের মালা দেয়া হতো। ষাঁড় বল্লে: তা আর জানিনে: বহু বৎসর আগে আপনিই তো আন্তর্জাতিক গরু সম্মিলনী' লিখে বাহবা পেয়েছিলেন। সেই সম্মিলনীর প্রধান অতিথি ছিলেন আমার প্রপিতামহ নেক-কদম। আপনি লিখেছিলেন যে তাঁর গলায় ফুলের মালা দেয়া হয়েছিল, আর প্রধান অতিথির দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে তিনি সেই মালা অর্ধেকই

Scanned with CamScanner

খেয়ে ফেলছিলেন। এর পর থেকে কাগজের মালার ব্যবস্থা করা হয়। তবে, শহরের গরুগুলি এমন হাড়-হাভাতে কাগজেও তাদের অরুচি নেই। তাই এখন গ্রাম থেকে বুনিয়াদী ষাঁড় এনে প্রধান অতিথি করা হয়।

আমি বল্লুম: হিজলছড়ি শহর থেকে অনেক দূরে। তাই তারা গরুর মালা দিয়েই মানুষের পালা মিটিয়ে দিয়েছে মনে হয়।

ষাঁড় বল্লে: হ্যাঁ, এটাই কারণ মনে হয়।
আমি বল্লুম: এই দশ মাইল কি করে?
ষাঁড় বল্লে: কোন চিন্তা নেই। আমার পিঠেই যেতে পার্বেন।

মালিক পথটা একটু নিরালা হওয়ার জন্য অপেক্ষা কচ্ছিলেন। আমাদের বংশের লড়ায়ে বলে আবার নাম আছে। পথে কোন ষাঁড় 'হ্যাঁক্কো' করে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে তো আমাদের আর হুঁশ থাকবেনা। অমনি তেড়ে গিয়ে তার ওপর চড়াও হওয়া চাই। তবে আমার নানী আছেন, বড় ঠান্ডা মানুষ। তার চেহেরা দেখে আপনি খুশি হবেন। মাথার দিকটা বড় ম্যাজেষ্টিক, যেমন শিং, তেমন চোখ, তেমন মুখের আদল। তবে, পেছনটাই একেবারে নষ্ট করেছে; একেবারে মাদি, একটা হাঁ করা ক্ষত ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়েনা।

এই বলে ষাঁড় 'নানী' 'নানী' বলে ডাক লাড়তেই এক মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ বোধ হয় জাবর কাটছিলেন। ষাঁড়ের বর্ণনা হুবহু মিলে গেল। আমার মনে পড়লো আমেরিকান সেই মানবীকে যিনি প্রচার কচ্ছিলেন: ষাঁড়দেরও পুরুষালী লজ্জা নিবারণের জন্য কাপড় পড়ার একটা ব্যবস্থা হওয়া উচিত। আমি ভাবলুম: গাভী-রাই বা বাদ যাবে কেন?

মালিক বল্লেন: নানী চেষ্টা কর্লেও সকালে আটটার পূর্বে পেঁছুতে পার্বে না। ততক্ষণে ষাঁড়-কুল জেগে যাবে। অনেকে এখনও

Scanned with CamScanner

তার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। তাকে দেখ্‌লেই তাড়া কর্বে। তখন সারা পথেই লড়াই লেগে যাবে।

আমরা রাত্রেই রওয়ানা দিলুম। মহাদেব ষাঁড়ের পিঠে চড়্‌তেন। তাই বুদ্ধিটা কিছু মোটা। মোটা বুদ্ধির দিক দিয়ে মহাদেবের সহিত আমার কিছু আত্মীয়তা আছে।

এখনও রাত ভোর হয়নি। ষাঁড়ের পিঠ থেকে বাড়ির দরজায় নেমে মালিক ও ষাঁড়-প্রবরকে অনেক ধন্যবাদ জানালুম।

কিন্তু, ঘরে ঢুক্‌তেই গৃহিনী খেঁকিয়ে উঠ্‌লেন। ওমা, গলায় আবার গরুর মালা কেন? এই মালা পরাবার জন্যই নাকি এত সাধ্যি সাধনা করে প্রধান অতিথি করে নিয়ে গেল? ফটোও উঠিয়েছে নাকি?

আমি বল্লুম: অনেকগুলো।

গৃহিনী বল্লেন: এই বুদ্ধি নিয়ে একুশের পদক পেলে! সরকার যে কি দেখে পদক দেয় তাও বুঝিনে!

Scanned with CamScanner

যেন ঃ তেন

—মাহবুব-উল আলম

৪ঠা এপ্রিল রবিবার বহদ্দার হাটের পূর্বদিকে নূরজ্জমা নাজিরদের বাড়ি গিয়ে দেখতে পাই যে আমার পরিবার এই আশ্রয়-স্থল ছেড়ে প্রায় ৯ মাইল উত্তরে ফতেয়াবাদ আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে গিয়েছে।

৫ তারিখ ভোরে চা খেয়ে আমি বাড়ির দিকে পদব্রজে যাত্রা করলুম। আশকর দীঘির উত্তর পাড় কায়েদে মিল্লাত রোড বেয়ে উত্তর দিকে সার্সন রোড ধরলুম।

মোড় ঘুরতেই রাস্তার ড্রেনের পাশে দাঁড়িয়ে একটা এগার বৎসরের বালিকাকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখলুম। সঙ্গে সঙ্গেই তার মা তিনচারটি শিশু সন্তান নিয়ে সেখানে এসে পড়লো। সকলে বুক কুটে কাঁদতে লাগল।

গিয়ে দেখি ড্রেনে পড়ে মরে আছে গৃহস্বামী এক বেবী ট্যাক্সি চালক। জোয়ান, গায়ে নূতন গেঞ্জি, তার উপর পরিষ্কার লুঙ্গী আল গোছে পরা, পায়ে স্যান্ডাল। তাকে পাঞ্জাবীরা গুলি করে মেরেছে। গেঞ্জীতে রক্তের দাগ। গুলি করেছে পেটে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা বিরূপ পরিস্থিতি মনের উপর ছায়া ফেল্লে।

আমি বরাবর এমন ভাবে চলি যেন কোথাও কিছু ঘটেনি। এ পর্যন্ত ভয়ে কোন পথ থেকে ফিরিনি, আর কোন ঘটনায়ও পড়িনি।

আজ, সার্সন রোড, চট্টেশ্বরী, কলেজ রোড ধরে চকবাজার ওলী খাঁর মসজিদের সামনে পৌঁছলুম। মসজিদের ছাদেও আশে পাশে পাঞ্জাবীরা ঘাঁটি করে বসে আছে। আমি রামগড় রোড ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হলুম।

Scanned with CamScanner

ওবেদুল্লা খানের বাড়ির পথ সমানে পেছন থেকে ডাক শুনলুম। ফিরে দেখি পূর্ব ধারে দাঁড়িয়ে এক সান্ত্রী। বেঁটেপানা, বয়স কুড়ির মত হবে।

আমাকে বল্লে : হাত উপর দিকে উঠাও। উঠালুম। বল্লে তাড়াতাড়ি আমার সামনে এসো। গেলুম।

আমরা মোট চার পথিক তার আহ্বানে এসে জমেছি। আমি, দ্বিতীয় জন চোখে চশমা, প্রৌঢ়, পকেটে কলম ও ঘড়ি, কোন ব্যবসায়ী হবেন। তিনি যাচ্ছিলেন আমার উল্টো অর্থাৎ গাঁ থেকে সহরের দিকে। অপর দুইজন সাধারণ ব্যক্তি লুঙ্গি পরা, অল্প বয়স্ক।

চ্যালেঞ্জটা হলো এ রকম।

তোমাদের কাছে কোন হাতিয়ার আছে।

আমরা : না।

: তোমাদের কার পকেটে কি আছে আমার সামনে মাটিতে রাখ। আমরা রাখতে লাগলুম।

আমার সাকুল্য নগদ আছে এক টাকার ১১ খানি নোট। দশ টাকার ২ খানি নোট আছে—অপরের কোন কাজের জন্য দিয়েছে। ফতুয়ার বাঁ পকেটে রেখেছিলুম নিজের ১১টি টাকা, ডান পকেটে অপরের নোট দুখানি। ১১টি টাকা মাটিতে রাখলুম।

আমার একটা দোষ আছে। কপট আচরণ কর্তে পারি না। কর্তে গেলেই সেটা মুখে চোখে ধরা পড়ে।

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্লে : তোমার নিকট আরও টাকা আছে। আমি বল্লুম : হাঁ, আরও কুড়ি টাকা আছে। এবার সে কুড়ি টাকাও মাটিতে রাখলুম।

: তুমি কে ?

Scanned with CamScanner

ঃ আমি কাজীর ডেউরীতে থাকি, এখন ফতেয়াবাদ চলেছি গ্রামের বাড়িতে।

ঃ সব ঝুটা কথা।

ঃ আমার কথা যে ঝুটা তার কি প্রমাণ তোমার কাছে আছে?

ঃ তুমি হিন্দু না মুসলমান?

ঃ মুসলমান। (আমি আমার প্রিয় আয়াৎ মোহাম্মদুর রসুলোল্লাহ্-আবৃত্তি কর্লুম। তার মধ্যে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য কর্লুম না)।

ঃ তুমি বিহারী না বাঙ্গালী?

ঃ বাঙ্গালী।

ঃ তুমি পাকিস্তানের গাদ্দার। (বলেই সে রাইফেলের বাঁটের এক ঘা বসিয়ে দিলে আমার ছাতিতে) (দ্বিতীয় ব্যক্তিকেও মারলে এক ঘা, সাধারণ যাত্রী দুজনকে বল্লে ঃ তোমরা চলে যাও। এবার অটোমেটিকের 'সাইট' নেড়ে চেড়ে বসালে)

ঃ আমি বুড়ো মানুষ, বয়স ৭৩। তুমি আমাকে মারলে অথচ প্রেসিডেন্ট আয়ুব আমাকে বই লেখার জন্যে নগদ দশ হাজার টাকা ইনাম দিয়েছিলেন।

ঃ সব ঝুটা কথা। তুমি কতখানি কেতাব লিখেছ?

ঃ আমি অনেক কিতাব লিখেছি।

ঃ নাম করো দেখি।

ঃ বাংলা বইর নাম করলে তার তুমি কি বুঝবে?

সে সঙ্গীন নেড়ে বল্লে ঃ এই জিনিস তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দিলে তুমি টের পাবে। আমি হঠাৎ আমার কোট খুলে ফেলতে যাচ্ছিলাম। মনে হলো ঃ কোট খুলছি কেন? তখন বল্লুম ঃ সঙ্গীনকে আমি ভয় করিনে। তোমার বাপের যখন জন্ম হয়নি তখন আমি সৈনিকতা করেছি তিন বৎসর রণক্ষেত্রে। ওসব বিদ্যে আমার জানা আছে।

সে টাকাগুলি মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে যার যার টাকা তাকে গুণিয়ে দিলে। মাটি থেকে অন্যান্য জিনিষপত্রও উঠিয়ে আমাদের ছেড়ে দিলে।

Scanned with CamScanner

কিন্তু, দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সহরে ঢুকতে দিলেনা, ফিরিয়ে দিলে। লোকটি ভারী মন-মরা হয়ে গেল।

পথে পড়তেই অল্প বয়স্কদের একজন বল্লে। যখন নাড়া নাড়া কল্পে তখন একটা জিনিষ আমি লক্ষ্য করেছি। বেটার গুলি ফুরিয়ে গিয়েছে! নয়তো আপনাদের গুলি করতো।

আমি হঠাৎ খুশী হয়ে উঠলুম। এর অনুমানটা ঠিক নাও হতে পারে। তবুও এর চোখের এবং বুদ্ধির তারিফ কর্লুম! এই সাধারণ মানুষকে একবার শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে পার্লে হয়।

আমি ভাবছিলুম ঃ সৈন্যরা টাকা-পয়সা কেড়ে নিচ্ছে এই গুজব অত্যন্ত জোর চলছে। তবুও এই ব্যক্তি আমাদের টাকা-পয়সা ফেরৎ দিলে কেন? হয়ত সে ভাল সৈনিক। হুকুমের বাইরে কোন কাজ করেনা। নতুবা, হয়তঃ ডিউটি থেকে যাবার পর সৈন্যদের এমন কড়া ভাবে তালাসী করা হচ্ছে যে কারু পক্ষে 'কিট' এর অতিরিক্ত কিছু রাখা সম্ভব হচ্ছেন।

মেসোপোটমিয়ায় আমাদের সৈন্য-বাহিনীর এক জনের সাথে আমার খুব দুস্তি হয়। পরে, আমি দেখি যে তাঁর চরিত্রে কিছুটা নীচাশয়তা আছে। তখন তাঁর থেকে আলগা হয়ে যায়। পরে আমরা যখন বাগদাদে তখন 'ডাম্প' এ তাঁর ও তাঁর দলের ডিউটী পরে। পরে 'ডাম্প'-এ টিনজাত অনেক খাদ্য দ্রব্য আনারস ইত্যাদি জমা থাক্‌তো। এগুলো গার্ড দেওয়াই ছিল আমাদের কাজ।

এঁরা তার কতক খেয়ে ফেলেন, কতক বিছানার ভিতর লুকিয়ে বেঁধে নেন। কিন্তু তাঁরা ফিরবার আগেই কমান্ড তৎপর হয়ে উঠেন এবং বিছানা তল্লাশী করে তাদের চুরি ধরে ফেলেন। তখন কোর্ট মার্শলে তাঁদের প্রত্যেকের ৩২ ঘা করে চাবুক শাস্তি হয়॥

আমি প্রধান সড়ক এড়িয়ে গ্রাম-পথে বাড়ী উপস্থিত হই। শুন্‌লুম নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্ট এখন পাঞ্জাবীদের দখলে এবং সড়ক দিয়ে চল্‌তে গেলে প্রাণ হাতে করে হাঁটতে হয়।

Scanned with CamScanner

পথে একটা জায়গা পড়েছিল যেখানে ১৯১৭ সালে যুদ্ধ বাধার আগে আমি কয়েক মাস স্কুলে মাষ্টারী করেছি। তার রেশ এখনও জেগে আছে। লোকে আমাকে এক দোকানে বসিয়ে চা খাওয়ালে আর আমার সে দিনের অভিজ্ঞতা আনুপূর্বিক শুনলে।

আমার বাড়ি আরও দু মাইল উত্তরে। এখানে পাঞ্জাবীদের ছায়া এখনও পড়েনি।

বাড়ীতে সকলে অভিজ্ঞতা শুনতে চাইলে। সবই বল্লুম, শুধু আঘাতটা চেপে গেলুম।

আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে সাহিত্যের জন্য কৃতি-গৌরব সীনিয়র পুরষ্কার ও পদক প্রাপ্ত সাহিত্যিক; আমার বয়স ৭৩ বৎসর। খাজা শাহাবুদ্দীন আমাকে বলতেন 'পাকিস্তানের সীনিয়র-মোষ্ট সাংবাদিক' বাংলাদেশে আমার চেয়ে বয়সে প্রবীণ সাহিত্যিক আর দুজনের বেশী নেই। শুধু বাঙ্গালী বলে ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল সকাল ঠিক ৮টায় আমার বুকে এই আঘাত হলো। মা বঙ্গভূমি, তোমার সন্তানের বুকে এই আঘাত যেন স্বাধীনতার ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।

Scanned with CamScanner

চির-অতৃপ্ত

(সুফিয়া এন্‌ হোসেনের ছবি দর্শণে)

মিলিল দরশ যদি কে হরিল বাণী!
তপস্যার অবসানে—ভাগ্য বলে মানি,
বাঞ্ছিতের পাইনু সন্ধান; স্মিতানন,
হাতে বরাভয় করে সুধা বরিষণ
ইন্দিবর জিনি দুটি আঁখি। সত্যে রাঙা
সুন্দর ললাট, এ যে মোর ধ্যানে আঁকা
জীবন দেবতা চিনে নিতে নাহি দেরী
হয়। কিন্তু, চির আপনার জনে হেরি
কে জানিত হৃদয়ের থেমে যাবে গান,
স্তব্ধ হবে যৌবনের বৃত্তি অফুরাণ—
সুখে দুখে দিবা—যামি, হে অন্তর—যামি!
রূপে রসে গন্ধে রচি হারা গান খানি
ছিল যারা আজিকার শুভক্ষণ মাগি?
এই ক্ষণ লাগি
দীর্ঘ সাধনার শেষে—হে দেবতা আজি
সিদ্ধিরে সম্মুখে রাখি হরে নিলে বুঝি
মোর সাধনার যত উপাচার, যত
ক্ষুদ্র আয়োজন, দরদের গান শত—
মোর পাপ, মোর মৃত্যু ভ্রান্তি অগনন
আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব মিথ্যার স্বপন! -
পতিতের গান, উঠার সংকল্প পুনঃ
জীবনের আলো ছায়া খেলা,—যার কোন
অংশ নাই মোর ভালবাসা ছাড়া যার
মাঝে জাগাইনি প্রাণ হেসে কেঁদে আর

Scanned with CamScanner

গাহি গান অনাগত দেবতার লাগি!

আজি তার পুরস্কার—
তুমি আছ, নাই কিন্তু আসক্ত আমার!
মিথ্যা কথা দেব, ভালবাসি পথের জঞ্জাল—
জঞ্জাল সে নহে শুধু—মানুষের হাল,
আমিও মানুষ কিনা— তাও বটে; তার
চেয়ে কিন্তু শতগুণ ভালবাসী আর
পূজা করি তোমার ও নাম। মানুষেরে
ভালবাসি তা'র ক্ষুদ্রতার লাগি—সে যে
মাটির মানুষ, তোমারে যে বাসি ভাল
সে তুমি সুদূর বলে, ধ্যান-লোক জ্বাল
বলে মোর মনে। জীবন দেবতা ওহে,
বাঁচিল যে সাধনার গান, গেহে
তার অবসাদ আনিবে যে আজিকার
ক্ষণ, এই সিদ্ধি সে যে মৃত্যু হবে তা'র!

ঝড় নাহি ওঠে প্রাণে? ওঠে, ওঠে প্রিয়,
মাথা খাও, তুমি তার খোঁজ নাহি নিও।
সে যে কি সে আমি জানি, তোমারে জানিতে
নাহি দিব। প্রতি রন্ধ্রে মোর যে বাঞ্ছিতে
থাকে দেবতার তপ্ত স্পর্শ—আরো কত
বলা নাহি যায়—ইচ্ছা জাগে কত শত—
ধ্যানেরে করিতে চুর, দেবতারে আনি
মাটীর মানুষ করি পরাইতে গ্লানি—
হীনতার শতকণ্ঠী মালা, বসাইতে
ধুলার আসনে, পঙ্কে দিতে গড়াগড়ি—
হীনতার কামনার যত ছড়াছড়ি!—

তুমি তার খোঁজ নাহি নিও। বাতায়ন
খুলে মাটীর মানুষ—গুপ্ত কক্ষে তার
উঁকি নাহি দিও। তাহারে বাসিয়ো ভালো
ধ্যান-লোকে সুন্দর হে, জেবলে তব-আলো
তাহারে দিওনা বর, নাহি দিও দেখা,

Scanned with CamScanner

দূর হ'তে শুধু তব পদ চিহ্ন আঁকা
নিশান—সেও বেশী নহে দুই এক খাল
পাঠাইও প্রকাশে তাহার। ভাবে আন্
যদি চাও বুকে তার জাগাইতে আশ
আঙুলের ছোপ দিও তাহার সকাশ।
এর বেশী নয় প্রিয়তম!
—এও বেশী এই মনে হয়। স্নিগ্ধতম—
আজি আসিয়াছ যদি ধ্যান-লোক ছাড়ি—
ও দৃষ্টি মেলিয়া ধর মোর দৃষ্টি 'পরি;
তারপর ধীরে ধীরে চলে যেও লোকে
তব—এই ধ্যান-লোকে। দিও এই লোকে—
মোর মর্ত্ত্য লোকে, শুধু ওই দৃষ্টি আর
হাতছানি। এই মোর ভাগ্য মানি, তার
লাগি আমি করিব তপস্যা ঘোর, প্রতি
পলে চালাইব রথ—নাহি শ্রান্তি যতি।
ওই দৃষ্টি পানে দৃষ্টি রাখি, হাতছানি
ওই লক্ষ্য করি বি জিগীষা মোর—
মাটীর মানুষ! কিন্তু নেশায় বিভোর!
এই তার শ্রেষ্ঠ নেশা, নিত্য জয় আশা—
জিয়াইয়া রাখিব তাহায়।
হে দেবতা! আজি আসিয়াছ যদি
ফিরে যাও, ফিরাইয়া দাও হারা নিধি—
মোর কন্ঠ, গান, সুর, রূপ, রস সবি—.....
শুধু চিত্ত হ'তে নিয়ে যাও হাহাকার
এই—স্পর্শের লাগি, লাগি একাকার—
এ নয় কি ব্যভিচার! —এই মিশামিশি
বাস্তবে ও কল্পনায়, এই দিশাদিশি
হারাইবয়া ফেলা দুই মিনিটের লাগি—
চিত্তে মোর ইহা যেন নাহি রয় জাগি।
আজি যে আসিয়াছিলে থাকুক গোপন—
শুধু দৃষ্টি হাতছানি রহিল আপন।

মাহ্‌বুব।

কাটীরহাট ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৭, ইংরেজী ২৫।১২।৩০ ইং

Scanned with CamScanner

নজরুল-স্মৃতি

(দারুণ-দিন আসল)

আমি বাঙালী বলেই সব শিখিয়েছিলাম।
সেজন্য সাথে আমি ঘনিষ্ঠ সাথ করি। কলেজে সব লেখাই,
আমার বিয়ে হয়, আমি কলকাতা ছেড়ে দেই।
আমি অধুনা ঢাকায় এসে বাস করি।
প্রমোশন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অধুনা ঢাকা-বন্ধু আমাকে
বারবার আমাকে ফেরত চলে। আমার মন বোঝে আমার
কোন কানে 'হায়, হায়, জীবনে আর এদের সাথে সাক্ষাৎ
হবে না!' আমি বুঝি কর্তে পারলাম: কিছুদিন পরে কম
হলেও আমি এদের সমবেদনা কর্তে পারি। তার উপায়,
দায় হয়েছিল সবাইকে সব শিক্ষার।
বৈষ্ণব, মুসলমান আর হিন্দু একাকার হয়ে গিয়েছিল।
এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ, হিন্দু বৈদ্য ও অন্যান্য কায়স্থ ছিলে
মধ্য-শ্রেণীর বেশার এরা মুসলমানী পূর্ণি করেছিল। এবং
সাথ এরা এরা 'বেয়ানী-মহাশয়' পূর্ণি করে। এবং
দৈহ্য রৌতিয়া বেয়ানী এদের প্রতিষ্ঠা খুব বাড়িয়ে দেয়।
এরা লোকে 'ভদ্র' ও 'ইতর'-এ ভাগ করে দেন। 'ভদ্র
লোক' মানে ভাবনে। আর সব 'ইতর লোক'। কাজ করে
এরা বাঙালী ও ভদ্রলোকের একাকার করে দেন।
এদের একজন বলেছেন 'আমরা অধীভূত হিন্দু'।
'ওরা', হিন্দুই হিন্দুরা, বৌদ্ধরা এরা, মুসলমানরা
বাঙালী নয়।

প্রথমের 'বাঙালী'রে অসাম্প্রদায়িক করে তোলার
এরা কৃতি ছিল। পুনরায়, বাঙালীরে 'সাম্প্রদায়িকতা'
দাঁড়িয়ে জাতীয়তা আন্দোলন জন্ম দেয়।

হিন্দু, বয়স্কদের অভিবাসী মানেই বিদেশে মনে
করা বাহুল্য। পুনরায়, সাম্প্রদায়িকতা অভিবাসী দেশ
দেশ এই ধারণা দেশের একের সহনশীল মনে নিল।
তার, প্রথমের ও মনে করা যে বয়স্কদের অভিবাসীর

মন্তব্য প্রকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ ৮৩ বছর বয়সেও মাহবুব-উল আলমের হাতের লেখা অপরিবর্তিত ছিল।

সাহিত্যিক মাহ্‌বুব-উল আলম

—সৈয়দ আলী আহসান

মাহবুব-উল আলম গল্প বলেছেন অসাধারণ তৃপ্তিতে এবং সহজ নিরাভরণ তীক্ষ্ণতায়। গল্পে তিনি একটি নির্মল বিশ্বাসযোগ্যতা নির্মাণ করেছেন—তিনি জানেন কতটা বলতে হবে এবং কখন থামতে হবে। তিনি ব্যাখ্যাকার নন, রচনারীতির চাতুর্যে তিনি সময়ক্ষেপণ করেন নি অর্থাৎ কৌশলগত অতিস্বর বা Overtone তাঁর কোন রচনায় নেই—কিন্তু তাঁর রচনা পরিচ্ছন্ন, জীবনময় এবং উপভোগ্য।

মাহবুব-উল আলম প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'ছোট গল্প তো কবিতা। ছোটো গল্পের মধ্যে গল্প লেখক চরিত্রের গতিবিধি অনুসরণ করে একটি অভিজ্ঞতাকে নির্মাণ করেন, আর কবি শুধু সেই অভিজ্ঞতার অন্তঃসারটুকু নিজের উপলব্ধি হিসেবে উপস্থিত করেন। তাই আমি বলি, কবি ও গল্প লেখকের মধ্যে তফাৎ নেই। দুজনের বেসাতি একই। শুধু ক্রেতার সামনে উপস্থাপনার তারতম্যটুকুই আছে।'

আমি যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করি তখন শহর থেকে বারো মাইল দূরে গাড়ী করে কর্মস্থলে যেতে হত। ফেরার পথে প্রায় দিনই কোনো না কোনো হাটের বেচাকিনার মধ্য দিয়ে ফিরতে হত। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরবার পথে আড়াইটা/তিনটের দিকে চৌধুরীর হাটের কাছে মাহবুব-উল আলমকে একটা ছোটো গলি থেকে বেরোতে দেখলাম। আমি গাড়ী থামালাম, তিনি এমনভাবে গাড়িতে উঠে বসলেন যেন তাঁর জন্যই গাড়িটি পূর্ব থেকে ওখানে থামাবার কথা। আমি জিজ্ঞেস করলাম 'এদিকে কি জন্য এসেছিলেন?' তিনি বললেন, 'এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে একটি গল্প শুনুন। মনে করুন পঞ্চাশ বছর আগে ছেলেটির বয়স ছিল চৌদ্দ বছর আর মেয়েটির বয়স এগারো। মেয়েটি সব সময় ছেলেটিকে বিরক্ত করত, ঠাট্টা করত, আর ছেলেটিকে দেখলেই হেসে উঠত। ছেলেটি অনেকবার চেষ্টা করেছে মেয়েটিকে শাস্তি

Scanned with CamScanner

দিতে কিন্তু সুযোগ পেয়ে ওঠেনি। একদিন খেলার মাঠে সুযোগ পেয়ে মেয়েটিকে তাড়া করে ধরে ফেলল কিন্তু কোন রকম শাস্তি বিধান না করে একটু পরে ছেড়ে দিল। কিছুদিন পর মেয়েটির বিয়ে হল। বিয়েতে ছেলেটিও গিয়েছিল। অনেক দিন পর একটা প্রয়োজনে চৌধুরীর হাটে এসেছিলাম। এদিক ওদিক ঘুরতেই একটি বাড়ি পরিচিত মনে হল। বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় ভেতর থেকেই শব্দ শুনলাম, একজন মহিলা তাঁর নাতিকে বলছে, 'যাতো দাদু, ওই বীর পুরুষটাকে ধরে নিয়ে আয়।' একটি সাত আট বছরের ছেলে আমাকে ডেকে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে গেলো। একজন প্রৌঢ় মাথায় ঘোমটা দিয়ে আমাকে সালাম করে বল্ল, একদিন শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, শাস্তি তো দেন নি। আজ আমি শাস্তি দেব। আমার এখানে খেয়ে যেতে হবে। আমি ওখান থেকে খেয়ে যেই পথে বেরিয়েছি তখন আপনার গাড়িটাকে পেলাম।'

এইভাবেই মাহবুব-উল আলমকে সবসময় আমি দেখেছি অফুরন্ত প্রাণের উৎস হিসেবে। আমি যখন ছাত্র তখন মাসিক মোহাম্মদীতে তাঁর 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল। মাসের শুরুতে এই অনবদ্য রচনাটি পাঠের আকর্ষণে আমি পত্রিকাটির অপেক্ষায় থাকতাম। সে এক আশ্চর্য লেখা-বিদ্যুৎ প্রবাহের মত তীব্র গতি, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত, এবং অসাধারণ মমতা এই রচনার সবাঙ্গ স্পর্শ করে আছে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক হিসেবে লেখক যখন মেসোপটেমিয়া গিয়েছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টিতে যে জীবন ও কর্মধারা চিহ্নিত হয়েছিল তারই একটা মূল্যবান পরিচয় এই রচনায় তিনি রেখেছেন। যে অঞ্চলের কথা তিনি লিখেছেন সে অঞ্চলের আমূল পরিবর্তন হয়ত এখন হয়েছে, কিন্তু মাহবুব-উল আলমের রচনায় তাঁর যে পরিচয়টি সাক্ষরিত হয়েছে, তা কখনই হারিয়ে যাবার নয়। আমি এই রচনা সম্পর্কে মাহবুব-উল আলমকে প্রশ্ন করেছিলাম, 'আপনি যখন মেসোপটেমিয়ায় তখন তো আপনি লেখক নন, তা হলে এই সুন্দর আকর্ষণীয় রচনাটি আপনি নির্মাণ করলেন কি করে?' তিনি উত্তরে বললেন' 'আমার কৌতুহল অদম্য। আমি যেখানেই গিয়েছি সেখানকার চলমান জীবনকে জানবার চেষ্টা করেছি। তাছাড়া আমার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল। পুরানো ঘটনা আমার যেভাবে মনে থাকে, নতুন ঘটনা সেরকম থাকেনা। অর্থাৎ এখনকার ঘটনা ঠিক এখনই আমার মনে আসবেনা। পুরনো হলেই নতুন করে স্মৃতিতে জেগে উঠবে। স্বভাবের এই পরিস্থিতি আমার এই লেখার

Scanned with CamScanner

প্রেরণা। নজরুল ইসলাম লেখাটির অসম্ভব প্রশাংসা করেছিলেন। আমি তাঁর উৎফুল্ল অভিনন্দন কখনই ভুলবনা।' আমি বললাম' 'আপনার এই লেখাটি আমার ছাত্র জীবনে যেন উপভোগ করেছি, এখনও তেমন উপভোগ করি। আমার মনে হয় আপনি যেভাবে অতি দ্রুত সাধারণ মানুষের কাছাকাছি চলে আসেন, সেভাবে লেখকরা পারেন না।

আমি চট্টগ্রামে থাকতাম কাজেম আলী রোডে একটি বাসায়। একদিন রোববার ১৯৬৭-র দিকে সকাল ১১টার সময় বাসায় একা বসে আছি, সম্ভবতঃ হাতে কোনো কবিতার বই ছিল, এমন সময় মাহবুব-উল আলম এসে উপস্থিত হলেন। তিনি দীর্ঘ পথ হেঁটে এসেছেন এবং এটাই তাঁর অভ্যাস। সকালে নিশ্চয় বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন এবং হাঁটা পথে নগর পরিক্রমায় বিভিন্ন পরিচিত জনের বাড়িতে থেমেছেন এবং নিশ্চয় তারই একটি পর্যায়ে আমার এখানে উঠেছেন। আমি বসতে বল্লাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি যে এত হাঁটেন ক্লান্তি আসে না?' তিনি বললেন, 'গাড়ির উপর আমার ভরসা নেই, আমার ভরসা দু'পায়ের উপর। তাছাড়া পথ চলতে কত পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হয়, একটু দাঁড়াই, কথা বলি, আবার চলি। এভাবে চলার মধ্যে যে কত আনন্দ তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না'। আমি তাঁকে এক গ্লাস গরম দুধ খেতে দিলাম। ধীরে ধীরে ক'চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে তিনি বললেন, আমাকে এমনভাবে দুধ কেউ খেতে দেয় নি, আমার খুব ভাল লাগল। ছোটবেলায় মা বড় কাঁসার বাটিতে দুধ ভরে আমাকে খেতে ডাকতেন। দুধের যতটা স্বাদ তার চেয়েও বেশী স্বাদ হচ্ছে দুধ দিয়ে আপ্যায়নের। আমি এর পরিবর্তে আপনাকে কি দিতে পারি? একটি গল্প উপহার দিই কেমন! শুনুন তাহলে। দুই বন্ধু ছিল। একজন সদ্য বিবাহিত। আর একজন বিবাহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। যে বিবাহিত সে প্রতিদিন তার অবিবাহিত বন্ধুকে রাত্রির বিবরণগুলো শোনায় আর অবিবাহিত বন্ধু আগ্রহ ভরে সে গুলি শোনে এবং বিয়ে হলে সে কি করবে মনে মনে তার মহড়া দিতে থাকে। কিন্তু বিবাহিত বন্ধুর রাত্রি কালের বিচিত্র সাহসের খবর বেশি শুনতে শুনতে অবিবাহিত বন্ধু ভয় পেয়ে গেল। সে আর বিয়ে করতে চায় না। কোন্ পাত্রী কি রকম হবে এটা ভাবতেই তার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। অবশেষে তার বিয়ে হল। বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করে সে বাসর শয্যায় শুয়েছে। পরদিন পূর্ব'বিবাহিত বন্ধু নব বিবাহিত বন্ধুর খোঁজ নিতে এসে দেখে বেচারি

Scanned with CamScanner

বাড়ীর সামনে বসে বিমর্ষ মুখে ঘাসের ডগা চিবোচ্ছে। জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁরে, তোর এমন দুরাবস্থা দেখছি কেন? নববিবাহিত বন্ধু বল্ল, তোর পরামর্শমত তো অগ্রসর হচ্ছিলাম বউ ঝামটা দিয়ে সরিয়ে দিল আমাকে। পূর্ববিবাহিত বন্ধু বল্ল, চল ঘুরে আসি। একটু পরামর্শ করা যাক। পথ চলতে চলতে হঠাৎ পূর্ববিবাহিত বন্ধু বলল, 'ফয়শালা পেয়ে গেছি। সমুদ্রের বড় শিং মাছ কি করে ধরে জানিস? মাছের তলপেটে সুড়সুড়ি আছে। ওখানে হাত দিতে পারলেই মাছ অবশ হয়ে যায়।' এইটুকু বলেই মাহবুব-উল আলম বললেন, 'এর পরের ঘটনা তো আপনি অনুমান করতে পারেন। নববিবাহিত বন্ধু পূর্ব বিবাহিতের উপদেশ নিয়ে ঠিক মত অগ্রসর হতে পেরেছিল বলেই এর পরদিন সকালে তার ঘুম ভাঙ্গতে বেলা একটা বেজে যায়।' মাহবুব-উল আলমের গল্প বলার ভঙ্গি, চতুর এবং কুশলী বাক্য বিন্যাসে আমি হেসে ফেললাম। অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা কিন্তু সাধারণ জীবন থেকে উপমা নিয়ে তাকে উপভোগ্য ও রসময় করা হয়েছে। মাহবুব-উল্ আলমের লেখা তাঁর গল্প বলার মত। তিনি জীবন রসিক ও প্রাণময়। তাঁর প্রতিটি গল্পেই অনুভব করা যায় যে তিনি মাটির অত্যন্ত কাছাকাছি তাঁর গল্পে মাটির গন্ধ পাওয়া যায়, সকাল বেলা খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটার মত অনুভব জাগে। অতি সাধারণ মানুষগুলো তাঁর গল্পের মধ্যে আনাগোনা করে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছ তখনই তিনি মাহবুব-উল আলমের অপূর্ব রসবোধের কথা বলেছেন, 'ইংরেজীতে যাকে বলে Introspection অর্থাৎ মর্মমূলে প্রবেশ করার ক্ষমতা, মাহবুব-উল আলমের মধ্যে সেই ক্ষমতা আছে। তিনি বাইরে অবয়বকে স্পর্শ করেন না, হৃদয়কে নাড়া দেন।' অন্নদাশঙ্করের সঙ্গে আমি এ ব্যাপারে একমত। আমি মনে করি, মাহবুব-উল আলমের যথার্থ মূল্যায়ন আমাদের দেশে হয়নি। তিনি অনেকের মধ্যে একজন নন, তিনি একাই সম্পূর্ণ। তিনি কাউকে ঈর্ষা করেন নি, কিন্তু তার সমসাময়িক অনেকেই তাঁকে ঈর্ষা করেছে। তিনি একবার আমাকে বলেছিলেন, 'একজন মানুষের জীবনে যখন সংকট আসে, সেই সংকট মুহূর্তের জন্য যথার্থ সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করা একজন গল্প লেখকের কর্তব্য। আমি সেই কর্তব্য পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র।'

তার 'মফিজন' গল্পটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন গল্পটিকে নিয়ে তুমুল বাকবিতন্ডা হয়, অনেকেই গল্পটিকে অশ্লীল ও যৌনভাবহ বলে

Scanned with CamScanner

চিহ্নিত করেছিলেন। মাহবুব-উল আলমকে এ সম্পর্কে প্রশ্ন করাতে তিনি উত্তরে বলেছিলেন,' যাঁরা এ গল্পকে অশ্লীল বলে তাঁরাই এই গল্পটি পড়ার সময় নিশ্চয়ই জানবেন, বার বার ঢোক গিলেছেন। এখানেই আমার গল্পটির সার্থকতা।' একটু থেমে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'আপনার কেমন লেগেছে?' আমি বলেছিলাম, 'অল্প পরিসরের মধ্যে আপনি একজন গ্রাম্য রমণীর দেহগত পরিপুষ্টি এবং তার মানসিক প্রতিক্রিয়া যেভাবে প্রকাশ করেছেন তা আমাদের সাহিত্যে নতুন। রমণীর শরীর এবং মনের সার্থকতা এবং সফলতাকে আপনি সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন। তবে আমার মনে গল্পটিকে আরোও একটু বড় করলে ভালো হত।'

"মোমেনের জবানবন্দী" মাহবুব-উল আলমের আত্মজীবনী। জীবনের কর্ম প্রবাহ নয় কিন্তু জীবন জিজ্ঞাসার বিচিত্র কল্লোল গ্রন্থটিকে মহার্ঘ করেছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্বভাবের জাগরণ এবং চৈতন্যোদয়ের রোজনামচা এ-বইটি। একজন মানুষের বিশ্বাসের স্বরূপ কি? কোন তাৎপর্যে বিমণ্ডিত মানুষের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা? জীবন কথার স্মৃতিমন্থনে এ সমস্ত প্রশ্নের উত্তর ভেসে উঠেছে।

অনেকদিন বইটি বাজারে ছিলো না। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সিলেবাসে স্নাতক শ্রেণীর জন্য নির্দিষ্ট করার পর বইটি আবার মুদ্রিত হয়। কোনও দেশের কোনও বিপ্লবের সাংস্কৃতিক অভিমত দ্বারা মাহবুব-উল আলম কখনও আক্রান্ত ছিলেন না। তিনি মনে করতেন, এ সমস্ত একটি ঔদ্ধত্যের মতো। তিনি সরল বিশ্বাসে সাধারণ মানুষের আকুলতার নিকটে এসেছেন। তাঁর প্রতিটি গল্পে সহজ প্রত্যাশার রূপায়ণ লক্ষ্য করি। আমি যখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সে সময়ে একবার মাহবুব-উল আলম আমার বাসায় ছিলেন। আমার নিজস্ব পারিবারিক পরিবেশে তিনি নিজকে মিশিয়ে ফেলেছিলেন। খেতে বসে কত কথা যে বলেছেন তার অবধি নেই—মানুষের কথা, পাখীর কথা, গরুর কথা, গাছের কথা, তিনি বলেছেন 'আমি পথ হেঁটে হেঁটে গাছ দেখি, গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিই। গরু-ছাগলকে দেখি নিষ্পাপ নির্বিরোধে ঘাস খেয়ে যাচ্ছে, তার চলার ছন্দ আমাকে মুগ্ধ করে। মনে মনে বলি, আমিতো তোমাদেরই—যেমন আমি গাছের, তেমনি আমি গরু-ছাগলের, তেমনি আমি সাধারণ মানুষের।' জীবনকে স্পর্শ করেই মাহবুব-উল আলম জীবন্ত। চিরদিন জীবন্ত থাকবেন।

Scanned with CamScanner

মাহবুব-উল আলম স্মরণে

অধ্যাপক আসহাব উদ্দীন আহমদ

অগ্রজপ্রতিম লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক মাহবুব-উল আলম আর ইহজগতে নেই। গত সাতই আগষ্ট সন্ধ্যায় চুরাশি বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আর্মেনিয়া, কাজাকিস্তান প্রভৃতি অঞ্চলে ১৫০, ১৬৮ বছর পর্যন্ত সুস্থ দেহে লোক বেঁচে থাকে বলে শুনেছি। আমাদের দেশে চুরাশি বছরকে দীর্ঘায়ু মনে করা হয়। আমাদের দোয়ার দৌড়ও শতবছর পর্যন্ত বলা হয়, শতায়ু হও। দেড়শ দু'শবছর বলা হয়না। কাজেই তাঁর মৃত্যু অকাল মৃত্যু নয়। তবু বাংলা সাহিত্যের আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোভাব এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি করেছে যা মনকে তীব্রভাবে পীড়িত করে তুলেছে। ব্যক্তিগতভাবে অকাল মৃত্যু না হলে কারো মৃত্যুতে আমি বেসামাল হয়ে পড়িনা। আমার লজিক হল: জন্ম মানেই মৃত্যু। 'জন্মিলে মরিতে হবে। অমর কে কোথা কবে।' আর এখন নিজের বয়োবৃদ্ধি ঘটাতে কারো মৃত্যুসংবাদ শুনলে প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হল কি জানি কবে আমার নামেও আজ-রাঈলের সমন এসে পড়ে, কি জানি 'ওয়েটিং লিষ্টে' আমার ওপরে আর কতজন আছে। এক বিলেত ফেরত বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে এক ইংরেজের কবরের ফলকে নীচের কথাগুলো লিখা রয়েছে। কথাগুলো আমার কাছে খুব সান্ত্বনাদায়ক:

Weep not, lament no more,
I am not lost,
But gone a little before,

অর্থাৎ বেশী কান্নাকাটি করে লাভ নেই। আগে আর পরে সবাই তো এখানে এসে পেঁছাচ্ছ। মৃত্যুকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারাই আমাদের কাম্য হওয়া উচিত। এটাকে আমি সুস্থ জীবনবোধের পরিচায়ক বলে মনে করি। মৃত্যুর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী জীবনবোধ যাচাইর অন্যতম মাপকাঠি। মাহবুব-উল আলম জাতির জন্য মূল্যবান সাহিত্য সম্পদ রেখে গেছেন

Scanned with CamScanner

আজ থেকে 'গৌড়জন আনন্দ করিবে পান সুধা নিরবধি। তিনি একটি অনবদ্য ফটোও রেখে গেছেন যা পত্র-পত্রিকায় তার মৃত্যু উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। চমৎকার এক খানা হাসি হাসি মুখ যা দর্শকের মনে সুখ, মুখে হাসির সঞ্চার করে। মরদেহে সযত্নে কবরে রক্ষিত হবার পর আমাদের সবার কাছে দৈহিকভাবে তিনি ফটোই। এই হাসিমুখো ফটোটিও দেশের সংস্কৃতির ভান্ডারে এক অপূর্ব সম্পদ। তাঁর হাতের লিখা ছিল মুক্তার মালার মত। তাঁর হস্তাক্ষর ও আমাদের সাংস্কৃতিক সম্পদ। আমার এ নিবন্ধটি তাঁর সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন নয়। তাঁর মৃত্যুতে মনের ভার লাঘব করার জন্য সংক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ মাত্র। তাঁর জানাজা প.ড় এসে কলম হাতে নিয়ে বসেছি।

মাহবুব উল আলম পরিবারের সাথে আমার সরাসরি সম্পর্ক ১৯৩২ সাল থেকে। আমি বাণীগ্রাম হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে উচ্চতর বাণীপিঠ অর্থাৎ- চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হই। মাহবুব উল আলমের ছোটভাই ওহীদুল আলমও ফতেয়াবাদ হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হন। সে সময়ে গড়ে ওঠা আলম পরিবারের সাথে আমার বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তাবোধ, এই অর্ধশতাব্দী ধরে জীবন্ত, প্রাণবন্ত রয়েছে। আমার ব্যক্তিগত জীবনে এটা একটা গৌরবের বিষয়। আমার প্রাগাঢ় আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে এমন একটি পরিবারের সাথে যার সদস্য সংখ্যা ছেলে মেয়েদের ও তাদের সন্তান সন্ততিদের নিয়ে বিরাট এবং যে পরিবারে ম্যালথাসকে কোন আমলেই দেয়া হয় না। আর সুখের কথা, দেশের জন্য সৌভাগ্যের কথা যে, এ পরিবারের নারী পুরুষ প্রত্যেকের হাতে রয়েছে কলম অথবা তুলি, কারো হাতে দুই-ই। তার ওপর কন্ঠচর্চায়ও নিয়োজিত রয়েছে পরিবারের অধিকাংশ সদস্য। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যশালী পরিবারের স্রষ্টা মাহবুব-উল আলম। সত্যি বলতে কি ১৯৩২ এর আগেই এ পরিবারের সাথে আমার একটা আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শহরের সাথে সুষ্ঠু যোগাযোগ বিহীন গ্রাম্য স্কুলের ছাত্র থাকা-কালীন আমি বেশ কতকগুলো পত্র-পত্রিকার গ্রাহক ছিলাম এবং খুটিয়ে খুটিয়ে পড়তাম। যেমন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী, মাসিক মোহাম্মদী, সাপ্তাহিক সওগাত, মাসিক সওগাত, দি লাইট, দি মুসলমান।

Scanned with CamScanner

খুব সম্ভব ১৯৩০ সালে আমি মাসিক সওগাতে মাহবুব উল আলমের ভাই কবি দিদারুল আলমের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করি। পাঠ করি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর রোমাঞ্চকর জীবন কাহিনী ও সাহিত্য কর্মের আলোচনা। তার রোমান্টিকতা আমার মনে রোমাঞ্চের সৃষ্টি করে। আমার অন্তরলোকে তাঁর স্থায়ী আসন হয়। সে সময় বড় বোনের এক ছেলে হয়। আমি তার নাম রাখি দিদারুল ইসলাম।

১৯৩২ সালে কলেজে ভর্তি হবার পর আমি ওহীদের সাথে বেশ ঘনিষ্ঠ হই। তার বাসায় যেতাম। ওহীদের আম্মা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। সেখানে আর থাকত উমু (বেগম উমুরতুল ফজল)। তখন সে পঞ্চম কি ৬ষ্ট শ্রেণীর ছাত্রী। প্রায় রোববারে আমি আর ওহীদ বাটালী পাহাড় ও অন্যান্য পাহাড়ী এলাকায় বেড়াতে যেতাম। তখন এলাকা জংগলাকীর্ণ ছিল। উমুও সাথে যাবার জন্য বায়না ধরত। সে আমাদের সাথে সমান বেগে হাঁটতে পারত না বলে আমরা তাকে পথের বোঝা মনে করতাম। কিন্তু চাচী আম্মার সুপারিশের কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। মাহবুব উল আলম গ্রামাঞ্চলে কোথায় সাব রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁর সাথে আমার দেখা ছিলনা। কলেজ এর পড়া শেষ করে আমি আর ওহীদ খানিকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। তবে মোটামুটি একটা যোগাযোগ আমরা রক্ষা করতাম। নিঃসন্দেহে এই পরিবারের সাথে সম্পর্ক হওয়াতে আমার সাহিত্যপ্রীতি বৃদ্ধি পায়।

যতটা মনে পড়ে ১৯৩০ সালে মাসিক 'মোহাম্মদীতে' মাহবুব উল আলমের 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' এবং ১৯৩৩ সালে 'বুলবুল' এ তাঁর 'মোমিনের জবান বন্দী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। এই দুটো লেখা শিক্ষিত সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে এবং সর্বত্র আলোচিত হতে থাকে। তাঁর লেখার মৌলিকত্ব ও স্বকীয়তা সুধী মহল কু বেশ নাড়া দেয়।

মাহবুব উল আলমের সাথে আমার প্রথম দেখা সিলেটে, এক পুজোর ছুটিতে, ১৯৪৯ সালে। তখন তিনি সেখানে জেলা রেজিস্ট্রার। এর পর তাঁর কাছে আমি আমার প্রথম লেখা বাদলের ধারা ঝরে ঝর্ ঝর্'

Scanned with CamScanner

ডাকে পাঠাই। তিনি লেখাটি পড়ে ফেরত পাঠান এবং মন্তব্য করেন লেখাটি স্থান বিশেষ কাঁচা হয়েছে। পরে আমি লেখাটি কিছু মেরামত করি এবং ১৯৬৬ সালে প্রকাশ করি। একটা আট বছরের ছেলেকে চিঠি লিখতে বসি ১৯৪৯ এর এপ্রিলের অকাল বাদলায়। তিনদিন একটানা বাদলা চলল। তিনদিন একটানা আমার লেখাও চলল। চিঠি একটা ছোট্ট বই হয়ে যায়। এ হল 'বাদলের ধারা ঝরে ঝর' ঝর এর জন্ম-কাহিনী। লেখাটি 'সাপ না ব্যাঙ' কি হয়েছে আমার সুস্পষ্ট ধারণা ছিলনা। তাই তাঁর কাছে মতামতের জন্য পাঠিয়েছিলাম।

১৯৫০ সালে আমি কুমিল্লা কলেজে চাকুরী নিই। ১৯৫২ সালের দিকে মাহবুব-উল আলমের পদোন্নতি হয়। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগ ও ময়মনসিং এর ইন্‌সপেক্টর অব্‌ রেজিষ্ট্রেশন হন। কুমিল্লায় আসলে তিনি আমার বাসায় উঠতেন। (পরে তিনি সপরিবারে কিছুকাল কুমিল্লায় থেকেছিলেন)। আর বলতেন, ঢাকায় ফেরদৌস এর (অবসর প্রাপ্ত ডি,পি, আই ফেরদৌস খান) বাসায় আমার খুব আরাম লাগে। কুমিল্লায় তোমার কাছে থাকতে খুব ভাল লাগে। তার আগমনে আমি খুব সুখী ও আনন্দিত বোধ করতাম। তিনি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। আমি চাইতাম আলোচনায় মোড় রাজনীতির দিকে ফেরাতে। তখন আমি আমার আগেকার ধ্যানধারণাকে অচল মাল সাব্যস্ত করে সমাজতন্ত্রেই সামাজিক সমস্যার সমাধান নিহিত এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি। ভাবতাম তাঁকে যদি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ গ্রহণ করাতে পারি তা হলে তা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত হবে এবং এতে সমাজের অগ্রগতি হবে। আমার মধ্যে ছিল নব দীক্ষিতের অতিউৎসাহ। ত লক্ষ্য করে মেকী ভদ্রতা না দেখিয়ে তিনি আন্তরিকতার সাথে খোলা দিলে তাঁর মনোভাব আমার কাছে তুলে ধরেন এবং বলেন: দেখ আমার অনেক বয়স হয়েছে। আমার নিজস্ব কতকগুলো চিন্তাধারা আছে। সেগুলোর শিকড় মনের গভীরে প্রবেশ করেছে, সেগুলো বদ্ধমূল হয়ে গেছে। আমার চিন্তাধারাকে ভেঙ্গে চুড়ে নতুন ছাঁচে গড়া যাবে না। তখন আমরা দুজনে 'লাকুমদীনকুম—আলিয়াদীন,' তোমার ধর্ম-তোমার, আমার ধর্ম আমার এই চুক্তি সম্পাদন করি। এই চুক্তি আমরা বরাবর মেনে চলেছি।

Scanned with CamScanner

এরপর আর কোন সময় সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন নিয়ে আমাদের মধ্যে তর্কের ঝড় উঠেনি।

১৯৫২ সালে কুমিল্লায় পূর্ব পাকিস্তান সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এর মূল সভাপতি ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। অন্যতম শাখা সভাপতি ছিলেন মাহবুব-উল আলম। সাহিত্য বিশারদ আমার বাসায় ছিলেন। মাহবুবদাকে বন্ধু মরহুম ইন্‌জিনিয়ার রফিকুল হকের বাসায় রাখি, ডঃ কাজী মোতাহের হোসেনের সাথে।

একদিন আমার বাসায় সাহিত্য বিশারদ মাহবুব-উল আলমকে বললেন, আমি মরলে তো আমার ওপর নিশ্চয় কিছু লিখবেন। তা এখন লিখে ফেলুন না। তাহলে আমিও পড়ে দেখার সুযোগ পাব। মাহবুব-উল আলম বললেন, আপনি মারা গেলে যে ধরণের অনুভূতি আমার মনে জাগবে সে অনুভূতিই তখন লেখার রূপ পাবে আপনি না মরলে সে অনুভূতি জাগবেনা। কাজেই এখন সে জাতীয় কিছু লিখা সম্ভব নয়। তখন আমি রসিকতা করে বললাম, সাহিত্য বিশারদ সম্পর্কে আপনার মূল্যায়ন গড়ার জন্য নানার (আমি সাহিত্য বিশারদকে নানা ডাকতাম) যখন এতটা আগ্রহ তখন একটা কাজ করি। সাহিত্য বিশারদ মৃত্যের মত উত্তর-শিয়র হয়ে শুয়ে থাকুন। আমি তাঁকে আপদ মস্তক একটা সাদা চাদরে আবৃত করে রাখি। দেখুন কিছু লিখা বের হয় কিনা, বিশেষ করে বুড়োর যখন এত শখ, তাঁর স্মৃতি—সভায় কি বলবেন তা আগাম শুনে পরপারে যাত্রা করার জন্য। এ নিয়ে বেশ কিছু হাস্যরসের অবতারণা হয়।

এর বছর দেড়েক পর সাহিত্য বিশারদ মারা যায়। আমরা উভয়ে সাহিত্য বিশারদ সম্পর্কে লিখি।

অন্যান্যদের সাথে আমাদের লেখা দুটী বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য বিশারদ 'স্মরণিকা'য় সন্নিবেশিত হয়। সাহিত্য বিশারদ নেই। মাহবুব-উল আলম ও আর নেই। আমি আছি।

১৯৫২ সালে আমার লেখা 'ধার' প্রকাশিত হয়। এ বইটি সম্পর্কে মাহবুবদা প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেন। তিনি এ বই সুধী মহলে

Scanned with CamScanner

বিলি করেন। কিছু বিক্রি করে এই দরিদ্র লেখককে সাহায্যও করেন। একদিন আমি শান্তি নিকেতন থেকে অন্নদা শঙ্কর রায়ের একখানা চিঠি পাই। তিনি লিখেছেন: 'ধার' পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। আপনার Wit ক্ষুরধার। আপনার Style চমৎকার। .....।' আমি মাহবুবদাকে বললাম, অন্নদা শঙ্কর রায় আমাকে চিঠি লিখেছেন। তিনি কি করে আমার বই পেলেন। তিনি বললেন: আমিই তাঁর কাছে তোমার 'ধার' এক কপি ডাকযোগে পাঠিয়েছিলাম। এই ছোট্ট ঘটনাটি আমার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং নতুন লেখকদের প্রতি তার অপরিসীম শুভেচ্ছার পরিচায়ক।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী হয় এবং এক অকল্পনীয় সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়। সামরিক শাসন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ জনতা প্রথমটায় শীতের পাতার মত টির টির করে কাঁপতে থাকে। আমি ছিলাম ঢাকায়। কয়েকদিন পর চাটগাঁয় আসি। যে মেসে থাকতাম সেখানে গেলাম। সাথীরা বলল, পালান পালান, পুলিশ তিন চার বার আপনার তাল্লাসে এসেছে। সাম্পানে বাড়ী রওনা হলাম। আমি মেস ত্যাগের অল্পক্ষণ পর পুলিশ সেখানে গিয়ে হাজির হয়। আমাকে মেসে না পেয়ে আই, বি পুলিশও কতক্ষণ পর সাম্পানে চড়ে। তারা আমার বাড়ীর পাশ দিয়ে পুলিশ আনতে যেতে লোকে দেখে। দুপুরে আমি খেয়ে দেয়ে পুলিশ আসার আশংকায় এক আত্মীয় বাড়ীতে অপেক্ষা করতে থাকি। আমি বাড়ি ছাড়ার বিশ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে দ্রুত আমার বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। সেদিনই রাতের আঁধারে গ্রাম ত্যাগ করি। (তারপর একটানা আট বছর আত্মগোপন থাকতে হয়।) শহরে এসে কাউকে পেলাম না। যারা আত্মগোপন করার তাঁরা আত্মগোপনে চলে গেছেন। যারা যোগসূত্র স্বরূপ ছিলেন তাঁরা সব পুজোর ছুটিতে বাড়ী গেছেন। কোথায় লুকায়। আমি সরাসরি মাহবুবদার বাসায় গিয়ে উঠি। যাবার পথে ভাবছিলাম, অরাজনৈতিক মানুষ, এই ভয়ভীতির মধ্যে কি জানি আমাকে দেখে তার কি প্রক্রিয়া হয়। ওহীদ আমাকে তার বাসায় নিয়ে যায়। আমি তাঁকে পূর্বাপর সব কথা জানালাম এবং বললাম, আয়ুব খাঁর ওয়ারেন্ট আমাকে গৃহহীন করেছে। এখন আপনি 'গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।' তাঁর মধ্যে ভয়ভীতির কোন লক্ষণই দেখলাম না। স্মিত

Scanned with CamScanner

হেসে তিনি বললেন, কোন দুশ্চিন্তা করনা, তুমি যতদিন খুশি আমার ঘরে থাক। তিন-চার দিন দিব্যি আরামে তাঁর কাছে থেকে আমি যোগসূত্রের সন্ধান পাই এবং নিরাপদ গোপন আশ্রয়ে চলে যাই। তাঁর এই সাহস ও অপরিসীম স্নেহের স্মৃতি আমার মনের মনি-কোঠায় চিরতরে অংকিত হয়ে রয়েছে।

১৯৭২ সাল। আমার তখন আত্মগোপনে দিন কাটছে। ৭২ এর ২৪শে জুলাই তাঁকে আমি গোপনসূত্রে একখানা দীর্ঘ চিঠি লিখি। সে চিঠির মাত্র কয়েক লাইন নিচে উদ্ধৃত করছি ঃ

দাদা, সালাম ও শ্রদ্ধা জানবেন। আপনার 'আল্লার মাইর' পড়লাম। ফুট নোটে দেখলাম ঃ রক্ত, আগুন, অশ্রুজল ঃ স্বাধীনতা নামে একটা বই লিখেছেন। এ বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আপনার কাছে পেশ করছি। এটা আমার মতামত আপনার ওপর চাপানোর চেষ্টা বলে মনে করবেন না। এটা পারস্পরিক চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিনিময়। এতে 'লাকুমদীনুকুম' চুক্তির সর্ত লংঘিত হয়না। এটা একের চিন্তার রাজ্যে অপরের আক্রমণ পরিচালনা নয়। আমাদের অনাক্রমণ চুক্তিতে বিনিময় নিষিদ্ধ বর. হয় নি।

কথা হল, পাকবাহিনী ও বিহারীরা এদেশের জনগণের উপর বর্বর নৃশংস অত্যাচার ও হত্যাকান্ড চালিয়েছে। তা লিখবেন। পরবর্তীকালে তাদের বিপক্ষ দলও অত্যাচার অনাচার চালিয়েছেন। তাও লিখবেন। একজন সাহিত্যিক হলেন সত্যের পূজারী, ন্যায়ের পূজারী, মানবতার পূজারী।.....

আমার হাতের লিখা তত ভাল নয়। তাড়াতাড়ি লিখাতে লেখা আরো খারাপ হয়েছে। পড়তে কষ্ট হবে। আপনার হাতের লিখা সত্যিই ঈর্ষার বস্তু। আপনার লেখা মুক্তার মালার মতো। আপসোস, ভাবী এই মুক্তার মালার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারলেন না। তা হলে তো তিনি সোনার হার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আপনার লেখাই মালা করে গলায় পরতেন।

এর বেশ কিছুকাল পর আত্মগোপন অবস্থায় অপ্রত্যাশিতভাবে এক জায়গায় মাহবুবদার সাথে আমার দেখা হয়ে গেল। কেমন আছেন

Scanned with CamScanner

জিজ্ঞেস করাতে তিনি বললেন ঃ বেশ ভাল আছি। অন্যান্য অবসর-প্রাপ্তদের মত লোক দেখলে পেট থাপড়িয়ে পেটের অসুখ ফিরিস্তি দিইনা। আজ পর্যন্ত ছড়ি লাঠিও হাতে নিইনি। বললাম ঃ What is the secret of your good health ? উত্তরে তিনি ছোট্ট একটি শব্দ করলেন ঃ হাঁটা। তিনি কখনো রিক্সায় চড়তেন না। সবসময় হাঁটতেন। আমি বললাম ঃ ঠিক কথা, Long walk means Long lif. অধ্যক্ষ আবু হেনা ছিলেন কয়েকটি হাঁড়ের সমষ্টি। তাঁর আজীবন সকাল বিকাল হাঁটার অভ্যাস ছিল। অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র সিংহও। তাঁরা উভয়ে দীর্ঘায়ু ও সুস্থ জীবনের অধিকারী হয়েছিলেন। আমি এবং ওহীদ ও হাঁটায় বিশ্বাসী। আমরা 'হাঁটাবাদী'।

এবার নিবন্ধের ইতি টানি। ৮১ সালের পহেলা ভাগে এক সকালে ওহীদের বাসায় যাই। সে বলল ঃ মাইজ্যাদার অবস্থা কাল খুব খারাপ হয়ে গেছিল। আমি বললাম, চল একবার দেখে আসি। গিয়ে দেখলাম তিনি সম্বিত ফিরে পেয়েছেন। আমাকে চিনতে পারলেন। উঠে বসতে চাইলে তুলে বসালাম। কিন্তু কথা বলতে বারণ করলাম। তিনি আমার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। অসহায় অবোধ শিশুর করুণ চাহনি। এদিক থেকেও বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশবই বটে। প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রের বন্দুক কাঁধে করা বীর যোদ্ধা, সাহিত্য ক্ষেত্রে তরবারির মত ধারাল কলমধারী যোদ্ধা জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক অসহায় শিশু। আমার দুচোখ বর্ষণ মুখর হয়ে উঠল। এই দেখা তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা।

মাহবুব-উল আলম আজ আর নেই। আমার স্মৃতিতে, দেশবাসীর স্মৃতিতে, সাহিত্য জগতে তিনি অমর হয়ে থাকবেন।

খলিফাপাট্টি,
ঘাটফরহাদবেগ,
চট্টগ্রাম।
৮। ৮। ৮১

Scanned with CamScanner

পয়লা মে থেকে বাইশে শ্রাবণ

—আবুল মোমেন

মানুষকে কীভাবে ভালবাসা যায়? কীভাবে জন্ম নেয় দেশপ্রেম? ঠিক বলতে পারি না, তবে এই হতভাগা সমাজে মানুষ ও দেশ তো দেখি শিক্ষিতজনের মুখের ফেরি—তার ভাষণের অলংকার, শোষণের মুখোশ। বানানো-ফেনানো এই প্রেম নিছক চাল, একটু রগড়—মানুষকে কুজ্ঝটিকায় ছেয়ে স্বার্থসিদ্ধির উপায়। ব্যতিক্রম নেই বল্লে চলে, থাকলেও তাদের বাস কোথায় আমরা জানিনে।

কীভাবে ভালবাসতে হয় মানুষকে? করুণা করে বা পুণ্যলোভে চাড় দিতে দিতে? নাকি কূট রাজনীতির টোপ ফেলতে ফেলতে? না জানি না ঠিক।

দেশ কি কেবল ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ জমি? জমি কি সুধুই মাটি, যেখানে শষ্য ফলে? দেশপ্রেম কীভাবে হয় খাঁটি? বলা কিম্বা বোঝা খুব মুশকিল।

দেশ এবং মানুষ মানুষের মৌলসারথি তার ভিত, উত্থানে রসদার। অথচ এই যোগটা আমাদের ক্ষীণ, জানাটা অপূর্ণ, বন্ধন নিষ্প্রেম। ফলে নিজেদেরই আত্মিক বিকাশের প্রক্রিয়া ঠেকে থাকে। প্রাণের তাজাভাব যায় ঘুচে, মনের স্ফূর্তি পায় হ্রাস। আমাদের অধ্যয়ন ও পরিপার্শ্বে শিক্ষা হরণ করে মহীরুহের ন্যায় উত্থানের শক্তিসাহস।

তখনও ছোট, স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ি। স্বাভাবিক হলো বড়রা দোষ খুঁজে বকবে, নয়তো দেখতেই পাবে না, আর চোখে নয় টুস্ টুস্ কথায় পোষা প্রাণীর তুল্য অর্থহীন আদর ঢেলে দু'মিনিটেই সরে পড়বেন। এ সময়ে একদিন আমার সঙ্গী হলেন তিনি। জ্যৈষ্ঠের রোদে রাস্তার

Scanned with CamScanner

পাঁচ বিচলিত'। তার ক্ষুধার চোট সামলাতে যেন পৃথিবী রুঠা হয়ে যাবে। দীর্ঘ বলিষ্ঠ উন্নতশির মানুষটার পাশে খর্বকৃশ ন্যাতানো কিশোর চলেছি আমি।'

প্রথমে এল যতীনের কথা। যতীন মুচি। সারি সারি জুতো, এবং তারও চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক কাঠের ডামি জুতোর ডাইয়ের মধ্যে, সে বসে থাকে। মুচিদের একমেবাদ্বিতীয়তম ঃ লোহার ত্রিপদী হাতিয়ার সামনে রেখে যথারীতি লুঙ্গি তুলে উরুর বারা দা বিছিয়ে পা-মুড়ে বসা ধ্যানস্থ শিল্পী যতীন। কী করে—কোথাকার লোক ? জানি না।

কিন্তু একটা আপত্যস্নেহে গলতে গলতে গল্পের মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হয়। জানা গেল যতীন রসিক লোক, ব্যক্তিত্ববান। নানা ডিটেলে তার প্রসঙ্গে তুলনা এলেন টলস্টয়। হ্যাঁ, চলতেই পারে। বিশ্ববরেণ্য লেখকের সাথে সামান্য মুচির সূক্ষ্মসামান্য কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কী যেন তুলনার উপলক্ষ সৃষ্টি হয়ে যায়। হতে পারেই। মনে পড়ছে না আজ পুঙ্খানুপুঙ্খ সব। তবে ওর সংসার হেনতেন ঘুরে উঁকি দিল ব্যক্তি মানুষটা—দুঃখ কী হতে পারে তার আকাঙ্খা বা কী তার !

ছিল মুচি, সে এক হাঁটাতে রূপ পেল মানুষে। মনে পড়ছে পাঠকের কমল ঘরামীর কথা ? হাঁটার নাপিতের গল্প ? 'কমল ঘরামীকে দেখিতে পারি না। মুখটার জিরান নাই। হরদম বকর বকর চলিয়াছে।

.....আমি ভাবি মুদ্রাদোষ মন জিজ্ঞাসা করে কখন হইতে এ মুদ্রাদোষের আরম্ভ ?

বটেই। এই প্রশ্ন বড্ড জরুরী, হয়ত এ পথেই ওর ভিতরকার মানুষটিকে পাওয়া যাবে। এগুতে এগুতে দেখি না কমল না নবীন কেউ আর ঘরামী মাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে মানুষ ট্রাজিক বেদনার ছোয়াচ লাগা মহৎ মানুষ। লোকটি কতখানি বড়। নিজের নিঃস্বতার ব্যাথা ভিতরে চাপিয়ে রাখিয়া অপর এক রিক্তের ব্যথা অবলীলাক্রমে বহিয়া যাইতেছে। মনে হইল ঃ এই যে কত বড় তাহার পরিমাপ একমাত্র কমলই জানে। তাই একমাত্র ইহারই শাসন কমল মানিয়া চলে।

Scanned with CamScanner

কাজটা হল ঐ। মানুষটা কোথায় খুঁজে বার কর, মোলাকাত হবে তার সাথে। তার সাথে কেবল তার সাথেই সখ্য। নানা কোণ থেকে লক্ষ্য করতেন, পড়তেন মানুষকে। প্রেমের চোখে আবিষ্কৃত হত মানুষের নানা কৌতুহলোদ্দীপক দিক। সস্নেহে গলতে গলতে গল্প পাড়তেন মানুষকে নিয়ে। বুঝলে……তুমি তো পাওনাদার; গেছ গ্রহীতার বাড়ি। স্বভাবতঃই তিনি চাইবেন টাকার কথা এড়িয়ে কীভাবে নিস্তার পান তোমার হাত থেকে। হয়ত বল্ল : আজ বড় ব্যস্ততা, এক্ষুনি বেরুব। শুনে তুমি বেরুতে যাবে তখন হয়ত ওর একটু অপরাধবোধ হল… বললেন, একটু চা খেলে হত না। তুমি রাজী হলে, চা আসতে আসতে গল্প জুড়ে দিলে। এমন হল যে গল্পটা তাঁর খুব মনে ধরল। সাগ্রহে শুনতে শুনতে ভদ্রলোক তোমার সঙ্গে কি এক অদৃশ্যবন্ধনে বাঁধা পড়লেন। এবং আলাপ শেষ হতে অযাচিতেই বলে বসবেন……আপনি কিছু টাকা পেতেন, আজ নিয়ে যেয়েন। শুধু তাই নয়, পাওনা শোধ করে ভবিষ্যতেও আরও কাজে লাগার অভিপ্রায় জানিয়ে তবে ছাড়েন।

তারপরেই আধখোলা চোখের মর্মগ্রাহী হাসি, যার ছটায় বিশ্ব-ভুবন মঙ্গল কল্যাণে টইটুম্বুর হয়ে ওটে।

চালাক চতুর কুটিল বাচাল নানাবিধ আড়াল সরিয়ে সরিয়ে তিনি নিরন্তর পেঁছুতে চেয়েছেন মানুষটার কাছে। ধনকুবের না নিঃস্ব রাখাল বিচারের ভিত্তি ছিল না এটা। মানবসত্তাটাই আদি, এর কাছেই প্রত্যাশা এর সাথেই বন্ধন। অতএব হোক জেলে, নৌকোর মাঝি, পিওন জঙ্গল মিয়া ঘরামী নবীন বা শিল্পপতি এ, কে, খান, চাই মানুষটাকে। একবার তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ছেলেকে লিখলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠের সাথে মানুষকেও পড়ো'। হ্যাঁ মাহবুব-উল আলম গোর্কির মতই পৃথিবীর পাঠশালার শাশ্বত ছাত্র। কিম্বা বলা চলে মানব পাঠশালার নিবিচল ছাত্র। কি এক রেওয়াজ দাঁড়িয়েছে একালে যে মানুষকে অতিধার চোগাচাপকান পড়তেই হবে। শুনি তিনি সর্বেষ্টর (সাব রেজিষ্ট্রার এর চট্টনামি অপভ্রংশ), সুসাহিত্যিক. সাংবাদিক ইত্যাদি। তারপর পুরোভাগে মিলিটারী-শৃঙ্খলায় বিরাজ করে বিরাট বিশ্লেষণ বাহিনীর। কিন্তু এই বাহ্য অন্তকঃ মাহবুব-উল আলমের জীবনচর্যা তাই বলে।

Scanned with CamScanner

প্রথম বই 'পল্টন জীবনের স্মৃতি' তাকে সাহিত্যে পাকা আসন দিয়েছে। তারপরে 'মো'মেনের জবানবন্দী, মফিজন, তাজিয়া, পঞ্চঅন্ন ইত্যাদি সে আসনে নতুন নতুন পালক যোগ করেছে। কিন্তু এলোক সে সাফল্যকে ভবিষ্যতের পুঁজি বলে ভাঙ্গিয়ে চললেন না। অথচ এমনটা দেখতেই তো আমরা অভ্যস্ত। অমুক শিল্প তমুক কাব্য এই উপন্যাস সেই নাট্য ইত্যাদির স্রষ্টা হিসেবে রাষ্ট্রীয় অলংকার রূপে মসৃণ উদ্বৃত্ত জীবর-যাপনেই ফুরাতে থাকেন সবাই। ইনি পঞ্চাশের দশকের পরে গল্প লিখলেন হাতে গোনা। তাঁকে কথাসাহিত্যের প্রতি ঔদাসীন্যের অনুযোগ জানিয়ে অন্নদা শংকর উত্তরে পান জাতিকে ইতিহাসের যষ্টি ধরিয়ে দেয়ার মহান দায়ের কথা।

স্বভাবে নীরব কর্মী চারিত্র্য পুরস্কারে ঠাসা এ মানুষের উপযুক্ত প্লাটফর্ম মেলা কঠিন। বিশেষতঃ যে পিছিয়ে-পড়া সমাজে তিনি বাস করেছেন সেখানে দল বাধা ও নেতৃত্বের যে গুরুত্ব তা পৌরুষের স্বভাব বিনয়ে তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করে গেছেন। বলছেন ইতিহাসে পরস্পরায় যুক্ত থাকার কথা, জাতি বাঁধার কথা কিন্তু নিজে বজায় রাখবেন লো প্রোফিল। এ সমাজ কি আগ বাড়িয়ে কাউকে বুকে তুলে নেয়, না যথার্থ মূল্যে শ্রদ্ধা করতে জানে? ফলে মাহবুব-উল আলমের মৃত্যুতে যে শোক প্রস্তাবের গৎ বাজছে সেটা একঘেয়ে, পুণরাবৃত্তিতে ঠাসা, রেওাজ রক্ষার ব্যাপার যেন। এ প্রসঙ্গে সত্যেন সেনের তুলনাটা মনে আসে।

গোর্কি বা সত্যেন সেনের মত মার্কসবাদে দীক্ষিত নন মাহবুব-উল আলম। তাঁর প্রক্রিয়াটা ছিল সৃষ্টিশীল দার্শনিকের। ছোটখাট ঘটনা, তুচ্ছ অভিজ্ঞতাকেও পুঁজি খাটিয়ে তাঁর দর্শণের চূড়ান্ত শীর্ষে উপনীত হতে চেয়েছেন। আমাকে একবার দুই আনুগত্যের কথা বলেছিলেন এক মাটিতে, দুই, মানুষে মানুষে মাটিতে যে যোগ যে কর্ষণকৃষ্টি তাই সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত। ফলে মার্কসবাদে দীক্ষিত না হলেও মানুষে আস্থা ছিল অবিচল, ভালোবাসা অনির্বাণ। আরেকবার বলেছিলেন মানুষের দুই অবস্থানের কথা। মানুষের ব্যক্তি ও ব্যাপ্তি দুই পর্যায়। পরিবার-চাকরি বন্ধুমন্ডল নিয়ে ব্যক্তির গন্ডি, আবার বিশেষ জাতি ও কালের

Scanned with CamScanner

প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের এক ব্যাপ্ত অবস্থানেও তার বাস। এই উভয় অবস্থানেই তার সঠিক ভূমিকা চাই। নিজেকে সঠিক অবস্থানে রাখার নিরন্তর প্রয়াস তাকে সর্বদা সতেজ রাখত। মোমেনের জবানবন্দির এক জায়গায় নিজেই বলেছেন সেলফ ক্রিটিসিজম আমার ভিতরকার মানুষটিকে শাণিত অস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার তীক্ষ্ণ ও ধারাল করিয়া রাখে অন্নদাশংকর রায় লিখছেন তাকে দেখলে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলেও তাঁর লেখা পড়লে তা বিশ্বাস হয়।

নিজেকে তিনি মোমেন যা বিশ্বাসী জ্ঞান করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস তাঁকে অন্ধ বা নিবীর্য করে দেয়নি, কেবল এক প্রসন্ন সৌহার্দ্যে জিইয়ে রেখেছিল দেহ ও মনের সজীবতা। উন্মুখ প্রশ্ন ব্যর্থতা ও অপ্রাপ্তির হোঁচট তাঁকে কম আঘাত করেনি। কিন্তু বিত্ত বিক্ষেপ ঘটাতে পারেনি কখনও।

'গায়ের মায়া'র হামিদ যেন তাঁরই দোসর। সকিনার হামিদকে কেন ভালো লাগে? 'হামিদকে তার এই জন্য ভালো লাগে যে তার দেহে যেমন মনেও তেমন এক রাত্রি ঘুণ নাই। এবং সখিনা বোঝে 'গায়ের এ মানুষগুলো বেশ সোজা মাটির বুক ফুড়ে উঠেছে আর সমস্ত পৃথিবীর মাটিই ধরা দিয়েছে এদের একজনের মুঠোর ভিতর'। মাটির বুকে দাড়ানো মানুষের জন্যে দায়বদ্ধ মানুষ মাহবুব-উল আলম। খোলা আকাশের নিচের মৃত্তিকায় তাঁর পক্ষপাত বরাবর, মৃত্যুর পরে এ তাঁর কোন নতুন ধাত্রী নয়।

মাটি ও মানুষের প্রতি অনুগত থেকে, ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক দায় স্বীকার করে জীবনের যাবতীয় চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেছেন তিনি। বীরত্বের প্রতি তথা ত্যাগ ও ঔদার্যের প্রতি তার সহজাত পক্ষপাত। উনিশ বছরের সদ্য পরিণীত নওলকিশোর পল্টনে নাম লিখিয়েছিল। হয়ত ঝোঁকের মাথায়, কিন্তু সে যুদ্ধে টিকে গেল ও যোদ্ধাজীবনের মাহাত্ম্যের দিকটিও উপলব্ধি করল। এর কারণ খুঁজে পাওয়া কঠিন নয়। তখন তার ভিতরে যুক্তিবাদী সত্য-সন্ধি মোমেন গড়ে উঠেছিল এবং সে যুদ্ধে অংশগ্রহণকে বাঙ্গালীর দুর্নাম ঘুচিয়ে বীরত্বের পরিচয় প্রতিষ্ঠার সুযোগ বলে বিশ্লেষণ করল।

Scanned with CamScanner

এই বিশ্লেষণের সূত্র ধরে চলে তার দর্শন। ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে নয়, চলতে চলতে গড়তে গড়তে ও বাড়তে বাড়তে তিনি পান দর্শনকে সাথী। এই চলমান কর্মনিষ্ঠ মানব হিতৈষী মুক্তমনা মানুষটিই প্রকৃত মোমেন। এই মোমেনের জবানবন্দীই লিপিবদ্ধ হয়েছে। প্রকৃতির স্বচ্ছস্নিগ্ধ তাজা স্বাদে দগ্ধ বগে!

ফলে অবসাদ ঔদাস্যবিমর্ষতার সাথে তাঁর জন্মের আড়ি। দেহ-মনে কোথাও ঘুণ নেই, সর্বময় সক্রিয়-চলছেন গড়েছেন বলেছেন। থিতিয়ে না পড়ে আশি বছর বয়সেও বিকাশমান মানুষ মাহবুব-উল আলম।

রবীন্দ্রনাথ বুঝি এই একটি চরিত্রকেই খুজে ফিরেছেন বারবার, যে কেবল চলে করে বাড়ে। চলবার বাড়বার মন্ত্র বেটে চলে। ডাকঘর শারদোৎসবের ঠাকুর্দা, রক্তকবরীর রঞ্জন ফাগুলাল ! স্বৈরাচার-অত্যাচার কিছুই এদের ঠেকাতে পারে না.....যেন প্রকৃতিরই অংশ বিশেষ বিন্ধ-বিধানে আপন খেয়ালে বেড়ে চলে। বুঝি এদেরই বলে মহীরুহ। মহীরুহ তো তাই ঝড়, জল রৌদ হিম ভোর নুপুর সন্ধ্যা-রাত কিছুই প্রতিকুল নয়, এমনকি ব্যক্তিগত আঘাত পিতাভ্রাতা জায়াকন্যার মৃত্যুও মোহ্যমান শোকে বাধতে পারেনা। শোকের গিট ছাড়িয়ে কাজ চলে... নিজের চাপানো কাজের দায় বওয়ার কাজ চলে। মাহবুব-উল আলমের সন্ধি কেবল পথের সাথে।

গত সিকি শতাব্দীর চট্টগ্রামে তিনি কিংবদন্তী পথিক। কে না দেখেছে ? কার সাথে না সহাস্য সৌহার্দ্য বিনিময় হয়েছে ?

মাথাটা ডান দিকে ঈষৎ হেলানো হাতে বই আহার্য বা তৈজয়ের পুঁটলী দীর্ঘাঙ্গ মানুষটির দৃষ্টি থাকতো মাটির দিকে। হাতে কিছু না কিছু থাকতোই। চলতেন হাতে কিছু থাকলে হাঁটার ছন্দ খুঁজে পাই।

তাঁর নিরলস হাঁটার দর্শনটা যেন এই কাজের প্রয়োজনের দাবী নিজের চেয়ে বেশী। নিজের প্রয়োজনে কাজ সৃষ্টি করে দশ জনকে ব্যতিব্যস্ত বিড়ম্বিত করতে দেখিনি। কাজের প্রয়োজনে নিজেকে কেবল ছুটিয়েছেন—খাটিয়েছেন থুড়ি, বাড়িয়েছেন। মহীরুহ তো !

Scanned with CamScanner

৭১ সনে, যখন বাহাত্তুরে বুড়ো তিনি, ২৯শে মার্চ থেকে শহর হিড়িক দেখে বারবার বলছিলেন 'সবাই শহর ছাড়লে চলবেনা'। ভয়ভীত পরিজনরা সে কথায় কর্ণপাত করছেনা দেখে গোঁ ধরলেন 'সবাই গেলেও আমি এ সময় শহর ছেড়ে যাব না'। সবাই চলে গেলে প্রতিরোধ যুদ্ধ হবে কিভাবে, এই ছিল তার বিশ্লেষণ। আশ্চর্য যে মানুষ গাঁয়ের মায়ায় মগ্ন, যিনি প্রায় ত্রিশ বছর শহরবাসের পরও লেখেন সগর্বে আমি গাঁয়ের ছেলে। শহরের নাগপাশে থাকিয়াও যাহার মায়া আমার চোখের অঞ্জন হইয়া আছে উহা আমার ছেলেবেলার পাড়াগাঁ'। তিনি গ্রামে ছোটার সুযোগটুকু নিলেন না। কারণ হামিদ ওরফে মাহবুব-উল আলম 'সোজা মাটির বুক ফুড়ে উঠেছে আর সমস্ত পৃথিবীর মাটিই ধরা দিয়েছে মুঠোর ভিতর এবং সে যা জেনেছে সত্য বলে অমনি লেগে গিয়েছে হাত দিয়ে, পা দিয়ে—সর্ব অবয়ব দিয়ে কাজে লাগাতে।

স্বাধীনতার এই ভয়ংকর প্রমাদ লগ্নে ৭৩ বছরের বৃদ্ধ ঐতিহাসিক দায়িত্ব বুঝে পক্ষ নিতে ভুললেন না, নিজের কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। এক সময়, এপ্রিলের গোড়ার দিকে, বলেছিলেন এখন দরকার রাইফেলের। 'আমাকে একটা রাইফেল এনে দিও। না বৃদ্ধ কৌতুক করেন নি বা পাঞ্জাবী নিধনযজ্ঞে রাগে অন্ধ হননি। শান্ত স্থির বরাবরের সৌম্য মানুষটি বিশ্বাসের মর্মমূল থেকে একথা বলেছিলেন।

এই বিশ্বাস এত দৃঢ়মূল ছিল যে স্বাধীনতার পরপরই নবীন রাষ্ট্রের ইতিহাস রচনায় পায়োনিয়ারিং-এ লেগে যান। জনে জনে গিয়ে, ঘরে ঘরে ঘুরে গ্রামেগঞ্জে শহরে জেলায় ঘুরে ঘুরে অনেকটা ক্রনিকল-এর আকারে লিখলেন বাঙালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত। ঘাটতি থাকল অনেক, কিন্তু ইতিহাসের বীজতলার পত্তন হল। ৮০ বছর বয়সেও তথ্যের সন্ধানে মানুষের প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা মানুষের সাক্ষাৎ-লোভে ধাপে চেপে চট্টগ্রাম থেকে যায় দিনাজপুর পর্যন্ত ছুটেছেন। এর সাথে আরেক নেশা : দেশ দেখা দেশ জানা মানুষ দেখা মানুষকে বোঝা। আশি বছরেও এই পিপাসা নিবারিত হয়নি। নানা বিপত্তি শারীরিক চোটপাট কিছুতেই হাল ছাড়েন নি। জানা এবং বিকশিত হওয়ার দর্শন তার 'আমি নিজেকে অনুভব করতে চাই সেই আদিতে যার আর আদি নাই। তারপর সম্ভাবনার

Scanned with CamScanner

অণুপরমাণু বেয়ে আমি রঞ্জিত হয়ে উঠতে চাই আমার পরিপূর্ণ বিকাশে (গাঁয়ের মায়া) এই সাধনা সক্রিয় ভাবে তিনি নামৃত্যু চালিয়েছেন।

মাত্র ছটি কি সাতটি ক্ষীণতণু গ্রন্থের মধ্যে তার মূল সাহিত্য-কর্ম সীমাবদ্ধ। পল্টন জীবনের স্মৃতি, মফিজন, মো' মেনের জবানবন্দী তাজিয়া, গায়ের মায়া, পঞ্চ অন্ন, আলাপ (অন্নদা শংকর রায়ের সাথে পত্রালাপ), গোফ সন্দেশ। এর বাইরেও বেশ কিছু গল্প, নক্সা ও কথিকা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

তাঁর বিখ্যাত বইগুলোর খ্যাতির কারণ কি ?

মো' মেনের জবানবন্দি পড়ে অন্নদা শংকর রায় লিখেছে।, সত্যিকার ভালো বইয়ের লক্ষণ এই যে তা বিস্ময় রসে রন্জিত তাকে যতবার পড়া যায় ততবার পড়তে চাওয়া যায়। তেমন বই হাজারে এক। এ বই তেমনি বই।

মফিজন পড়ে আবুল ফজল লিখেছেন, 'মফিজন' জীবনরসে এমন টলটলায়মান যে, জীবন যারা বোঝে, আমারত বিশ্বাস, সে সব পাঠকের কাছে এই গল্প রীতিমত আকর্ষণরূপে বিবেচিত হবে। তদুপরি সব কয়টি চরিত্র হয়েছে সজীব, জীবন্ত ও বিশিষ্ট। ভাষায়, ভাবে ও চরিত্র চিত্রণে যেখানে রূপ পরিগ্রহ করেছে অকৃত্রিম মানবীয়তার নির্ভেজাল চেহারা, তার আকর্ষণ আমার কাছে সত্যই অপ্রতিরোধ্য।

সুফিয়া কামাল এর মনে হয়েছে ঃ তার অপর লেখা বাদ দিলেও একমাত্র মফিজনই তাঁর দরদী মনের সাক্ষী হয়ে থাকত। নারীর মনের অকথিত ব্যাথার পরিচয় এত নিবিড় সন্ধানী দিয়ে, দরদী মন দিয়ে, আর কেউ নিয়েছেন বলে আমার জানা নেই।

অন্নদা শংকর লিখেছেন, 'মফিজন পড়ে তৃপ্ত হয়েছি। লেখাটি আকারে ছোট হলেও একখানি নিপুণ রেখাচিত্রের মত অল্পে সম্পূর্ণ। কোথাও অতিভাবণের চেষ্টা নেই, অপভাষণও নেই। সত্য তার অনাবৃত রূপ নিয়ে নিজের সৌন্দর্যের উপর ভর দিয়ে দাড়িয়েছে।

তাজিয়া পড়ে কাজী আবদুল ওদুদ সাধুবাদ দিয়েছেন অংকনের বৈচিত্র্য ও অজস্রতার, আমাদের 'মানসচেতনা সমৃদ্ধ' করার জন্যে।

Scanned with CamScanner

'পল্টন জীবনের স্মৃতি' পাঠ করে আবুল কালাম শামসুদ্দীন একেবারে তাজ্জব হইয়া গেলেন। কেন? এই কারণে যে আধুনিক মুসলিম বাংলা সাহিত্যের শৈশবে কোথা হইতে আসিল যৌবনের গরিমা লইয়া, এই নবীন সাহিত্য শিল্পী।"

১৯৩৩-৩৪-এর দিকে তাঁর প্রথম গ্রন্থ পল্টন জীবনের স্মৃতি 'মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হচ্ছিল। প্রথম লেখাতেই 'যৌবনের গরিমা'। সমালোচক কামাল উদ্দীন বলছিলেন 'তার হাতের কোন কাঁচা লেখার সাথে পাঠক সাধারণের পরিচয় হয়নি। তার কাছে যা আমরা পেয়েছি তা অত্যন্ত ভারী. অত্যন্ত রস পুষ্ট তার থেকে বাছাই করবার অবকাশ খুব কম।

তার বিখ্যাত সব বই-ই আকারে ছোট। ত্রিশ বত্রিশ পৃষ্ঠাই উপন্যাস চারটি গল্প নিয়ে ছোট গল্পের বই একশ' সোয়াশ পৃষ্ঠায় তিন বছরের পল্টন জীবনের স্মৃতিচিত্র শ' পৃষ্টার মধ্যে জবানবন্দী মূলক জীবন দর্শন ইত্যাদি।

কাজী আবদুল ওদুদের মতে মাহবুব-উল আলম স্বভাব-শিল্পী। তাঁর কথা সহজেই ব্যক্ত হয় রেখা ও রঙের বৈচিত্র্য নিয়ে'। কেমন এ সহজতা পরখ করা যাক ঃ

'পদ্মাকে নিয়েই আমাদের গল্প।

পদ্মার বুকে যা মানায় সে হলো পাল ভরা নৌকা। আর পদ্মার কূলে যা মানায় সে হলো লাল শাড়ী পরা মেয়ে, হোক সে যুবতী অথবা বালিকা অথবা বৃদ্ধা।' (যমপাখী)

'মফি তাকায় মুহূর্ত; কিন্তু কথা বলে অনেক। ডিম-ভরা কৈ'র মতো; ভিতরে সব দানা বাঁধিয়া আছে। ছাড়িতে পারিলে বাঁচে।' (মফিজন)

অথবা, 'রমিজ যখন চোখ খুলিল' মহাকাল তখন মুন্নার স্নায়ুতে স্নায়ুতে প্রাণের শেষ কণিকা টুকুতে তাড়াইয়া ফিরিতেছে। উর্ধে অনন্ত নীল

Scanned with CamScanner

আকাশ নিম্ন অসীম সবুজ ধরিত্রী মাঝখানে মুমার চোখ দুটি প্রাণহীন মুক্তার ন্যায় অপলক্ষে চাহিয়া আছে, ছিন্ন কন্ঠনালী ও উহার দুপাশের মাটিতে রক্ত জমাট বাঁধিয়া সবুজের বুকে যেন মরিচার যেন ধরাইয়া দিয়েছে। আর এই দৃশ্যে মূঢ় হতবাক পৃথিবী ও আকাশ যেন পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করিয়া স্তব্ধ হইয়া আছে।' (কোরবানী/তাজিয়া গ্রন্থভূত)

এমনি অজস্র উদাহরণ দেয়া চলে। যেন মুক্তোর দানা স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, যেন ডিম ভরা কৈ প্রাণরসে ভরপুর। একদিকে রেখা রঙের সহজ সমারোহে ভাষা পায় দীপ্ত, অপরদিকে অকৃত্রিম মানবীয় বেদনার বোধ তাকে মর্মস্পর্শী করে তোলে। তাঁর লেখায় পাঠক যা পাওয়ার তা প্রত্যক্ষভাবেই পায়, পরোক্ষতার কিছু নেই। কোন রকম চাপিয়ে দেয়া মতবাদ যেমন নেই, তেমনি নেই বিন্দুমাত্র শুচিবাই। ফলে নরনারীর দৈহিক মিলনের কথাও পবিত্র হয়ে উঠে তার অংকনে। মানুষের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ও তার ওপর গভীর আস্থার কারণে এমনটা হতে পারে। তার মধ্যে কাজী আবদুল ওদুদ দেখতে পেয়েছেন অন্তরের সবল প্রসন্নতা। প্রসন্নতা এনেছে ভাষায় লাবণ্য। অর্বাচীনের হাতে পড়ে যেসব লেখা অশ্লীল হয়ে ওঠে, যেখানে নারী তার মহিমা খোয়ায় তার চেয়ে নগ্ন বাস্তবের মুখোমুখি হয়েও মাহবুব-উল আলম বাস্তুবানুগ, রচনার শিল্পগুণ ক্ষুন্ন হয় না। মনুষ্যত্বের জন্য মর্যাদাবোধ আছে বলে সবসময় মানুষের বেদনাটা তার কাছে প্রধান। স্থূলতিক গল্পে জেলে বশীর ও বিদেশিনী মড এভেলিনকে বালুচরে পরস্পরের মুখোমুখি নগ্ন বসে থাকতে দেখে লেখক সুযোগ নেন না, সন্ধানী দৃষ্টি ফেরে বশীরের ট্রাজিক বেদনার উৎস সন্ধানে। যেমন নেই দুর্বলতা কিছুর প্রতি তেমনি নেই আপোষ প্রবণতা কোন সুযোগের সাথে। ফলে ভাষা চলে তরতরিয়ে, ভাব এগোয় অপ্রতিহত। একদিকে গড়ে উঠে রঙ ও রেখার সম্ভার আরেকদিকে জমে ওঠে রসের পশরা দর্শনের ব্যাপ্ত ভাঁড়ার।

তাঁর লেখনিকে কাজী আবদুল ওদুদ দুই ধারায় ফেলেছেন। একধারায় তিনি মুখ্যতঃ শিল্পী, ছবি আকায় যার যে আনন্দ তা ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর আর সব চেষ্টা; অন্য ধারায় তাঁর শিল্পীত্ব ম্লান

হয়নি, কিন্তু তিনি যে এক বিশেষ যুগেরও বিশেষ সমাজের মানুষ, সেই বিশেষ যুগের ও বিশেষ সমাজের ভাবনায় অথবা দুর্ভাবনায় তিনিও যে বিব্রত, তার পরিচয় স্পষ্ট। প্রথম ধারায় তাঁর অনন্য সাধারণ সাফল্য লাভ হয়েছে। মোমেনের জবানবন্দিতে দ্বিতীয় ধারায় তার বিশিষ্ট রচনা 'তাজিয়া'।

দুই ধারার মধ্যে ও যা অটুট থাকে তা তার শিল্পীত্ব। সেই শিল্পী যাঁর অন্তর সাবলীলভাবে প্রসন্ন যিনি মোমের অর্থাৎ বিশ্বাসী। বিশ্বাস মানুষে বিশ্বাস মাটিতে এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিগত ও ঐতিহাসিক দায়িত্বের প্রতি।

মাটি ও মানুষে প্রতি দায়বোধ তাকে বড্ড ভুগিয়েছে। ভুল বল্লাম—তাকে নয় ভুগিয়েছে আমাদের, তাঁর পাঠকদের একালের পাঠক জানেনই না। সাবেক কালের পাঠক তাঁকে ভুলেছে—বাঙ্গালী বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি। আর সচল প্রসন্নতায় এ মানুষ খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার তোয়াক্কা না করে জাতির অতীব প্রয়োজনীয় কাজ ইতিহাস প্রণয়নে লেগে পড়লে। অন্নদা শংকর আক্ষেপ করে লিখেছিলেন যে ইতিহাস রচনা জাতির জীবনে খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ এ কথা অনস্কীকার্য কিন্তু কাজটা আপনার নয়, আপনার ক্ষেত্র জাতির এ দায়টা আপনার থেকে নিজের কাঁধে চাপিয়ে জাতিকে তিনি অন্যদিক থেকে ঠকালেন না তো। বিশেষতঃ যখন বুঝি সাংবাদিকতা বা ইতিহাস প্রণয়নে তার তুল্য সৃষ্টি ক্ষমতা ও সাহিত্যরসের প্রয়োজন পড়ে না। সাহিত্য শিকেয় উঠল প্রায় অথচ এদিকে না প্রসার হল তাঁর ইতিহাস-চেতনা সৃষ্টির আন্দোলনের। তিনি প্রায়ই একাই কর্ণের মত গর্তে আটকে পড়া জমান রথ তুলতে চাইলেন, ইতিহাস চেতনার বিস্তার ঘটাতে চাইলেন, কিন্তু কর্ণ যেমন পারেন নি মাহবুব-উল আলমও পারলেন না।

কিন্তু কারণ কী ?

নিজেকে তিনি অভিহিত করেছেন দিনমজুররূপে। পয়লা মে তাঁর জন্ম দিন.....এই কাকতালীয় যোগাযোগকে সার্থক করে তোলার মত মনন ও শরীর নিয়েই তাঁর জন্ম। বারবার তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত স্বাস্থ্যের কথা পেড়ে নিজের অতিরিক্ত দায়ের কথা বলেছেন। আজীবন এই দায়

Scanned with CamScanner

স্বীকার করেছেন কর্মী মানুষ মাহবুব-উল আলম তবু কেন ব্যর্থতার কথা? এ কারণে কি যে এই ম্যান অব একশন ছিলেন না অর্গানাইজেন ম্যান?

তাঁর কোন কাজের সাংগঠনিক ভিত ছিল না পোক্ত নেতৃত্ব দেয়ার প্রতি আগ্রহ বা মনযোগ ছিল না বলে টীমও গঠিত হয়নি। সংবাদপত্র কিম্বা ইতিহাস চেতনা প্রসারের কাজে ধারাবাহিকতা চাই, চাই প্রাতিষ্ঠানিক ভিত। কিন্তু কাজগুলো হয়ে যে তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস জেদ ও অনলস প্রয়াসের ফলে। কাজের প্রক্রিয়া ছিল তাতেই আবদ্ধা যে এই পরিশ্রমী অতি মৌলিক মেধাবী মানুষটির কর্মব্যাপ্তিতে মুগ্ধ সে-ও পায় না।